মূর্তি

মহাশ্বেতা দেবী

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

মুক্তি

ছাতিম গ্রামে শহীদ দীনদয়াল ঠাকুরের ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনা ও যথোপযুক্ত ঢাকঢোলে সেটি স্থাপন-উদ্বোধন ইত্যাদি করণের সিদ্ধান্ত কলকাতায় মহাধিকরণে স্থির হয় এবং সংবাদটি সব কাগজেই বেরোয়। ছাতিম গ্রামের লোকজন স্বভাবতই তা জানত না। গ্রামটি ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড, সরকারী জঙ্গলমহলের আঁচলে অবস্থিত। মাটি ল্যাটেরাইট। কম-ফল্‌না। ফলে এ-মাটি কৃষিজীবী-জনসংখ্যা বেশি পুষতে-পালতে পারে না। ছাতিম এবং সদৃশ সাতটি গ্রামের সাকল্যে জনসংখ্যা তিন হাজারেরও কম। তফসিলী উপজাতি, যথা—সাঁওতাল-মুণ্ডা-ভূমিজ এবং তফসিলী সম্প্রদায়, যথা—ভুঁইয়া-হাড়ি-মুচি-শুঁড়ি-বাউরী—এরাই জনসংখ্যা। আটটি গ্রামে সাক্ষর মানুষ ত্রিশটিও নেই। যারা সাক্ষর, তারাও নিরক্ষরদের মতো পেটের ধান্দায় ব্যস্ত। কাগজ কেউ রাখে না ও পড়ে না। নিকটস্থ পুলিশ-থানা এগারো মাইল দূরে। মহকুমা শহর সাত মাইল দূরে। সেখানে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট আপিস, পোস্টাপিস, জঙ্গল আপিস, সোশাল ওয়ার্কার ট্রেনিং আপিস, স্কুল, স্কুল সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের আপিস, হেল্‌থ সেণ্টার, ধান-গোলা বা ধান্য-ঋণ ফলপ্রসূ করার জন্য স্থাপিত সেণ্টার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্যারাফেরনেলিয়া আছে।

সিনেমা গৃহটি মৌসুমী। শহরের মদন খাঁ (বর্তমানে মহাবিশ্ববাসী) খুবই তুড়বুড়ে ও ব্যস্তবাগীশ মানুষ ছিলেন। লাক্ষা ব্যবসায়ে তিনি দু-পুরুষে ধনী। দুষ্টলোকে বলে, সন্ত্রাসবাদী দীনু ঠাকুরকে ধরিয়ে দিয়ে

মদন-পিতা বদন খাঁ সায়েবদের কাছ থেকে অসঙ্গত পরিমাণে টাকা পান এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা লাক্ষা চাষে নিয়োগ করেন। মদনের হাতে সে টাকা দ্বিগুণ হয়। কেন না, অজ্ঞেয় কারণে পোস্ট্-৪৭ সরকার মদনকে দেশসেবী ঠাওরান এবং দেশ সেবার পুরস্কার-স্বরূপ ছাপ্পর ফোড়কে লাইসেন্স-পারমিট দেন—মদ থেকে বাস-সার্ভিস—সব কিছুরই। দেশ সেবা না করেও দেশ সেবার পুরস্কার পেয়ে মদন ফলাহারী-বাবার ছবিতে আম-আপেল কলা ইত্যাদি ফল গুণস্ঁচে গেঁথে মালা পরাবার সুফল বোঝে। তখন তার মনে কেন যেন নিজেকে অমর করার বাসনা জাগে ও উক্ত ইচ্ছার তাড়নায় সে বহু কাজ করতে থাকে, যা থেকে শহরবাসী সুফল পায়। জীবিতাবস্থাতেই সে মদন মেমোরিয়াল বয়েজ স্কুল, মদন স্মৃতি বালিকা বিদ্যাবীথি, মদন খাঁ ফুটবল মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ করে, মায় ছয় বেডের মদন খাঁ হাসপাতাল এবং সর্বত্র নিজের ছবিতে নিজে মালা পরিয়ে উদ্বোধন করতে থাকে। অবশেষে শহরের সংস্কৃতিবান ছেলেরা ওকে "মহান দেশনেতা" বলে প্যাঁক দিয়ে একটি রবীন্দ্র-সদন করতে বলে। মদন খাঁ তখনকার মতো রাজী হয়। কিন্তু হল আধাআধি হতেই সে বলে, আমার পয়সায় হল 'আমার নাম থাকবে না? নাম হবে মদন-রবীন্দ্র হল।'

এই স্টেজে অন্যেরা প্রবেশ করে এবং রবীন্দ্রনাথের নামের আগে "মদন খাঁ" নাম থাকার অযৌক্তিকতা বিষয়ে মদনকে বোঝায়।

মদন বলে, 'কথার নড়চড় হবে না। বেশ, নাম হোক রবীন্দ্র-মদন হল?'

হলের মাথায় টিনের ছাউনি পড়তে-না-পড়তে তার মত পাল্টায় এবং সে তার মোমেণ্টারি ডিশিশান জানায়। বলে, 'রবিঠাকুরকে নিয়ে তো অনেক হচ্ছে। ঠিক করলাম হলটা আমার নামেই হবে। আর কি জান? মূর্তি গড়াতে দিইছি আমার। ওই ১৯৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ আমিই উদ্বোধন করে দেব।'

যত রিমোট জায়গা হোক, স্থানটি পশ্চিমবঙ্গেই। শহর বাসিন্দেরা

খুবই ভিরমি খায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে জীবিত মদন খাঁর হাতে মদন খাঁ-হল উদ্বোধন হলে কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে তারা উল্টো প্যাঁক খায় এবং মদন বলে, এরকম করলে হলকে ধানের গুদাম করে দোব। তার এ ইচ্ছা আর ফলবতী হয় না। কারণ সহসা সে মেনিন্‌জাইটিসে মহাবিশ্বে ট্রান্সফার্‌ড হয়। উক্ত হলটি রবীন্দ্র হল। ওটি মৌসুমী সিনেমা হলও বটে। কেন না আমন ধান ওঠার পর চাষীর হাতে টাকা এলে ওখানে সিনেমা দেখান হয়। অন্য সময়ে হলটিতে শহরের যাবং সভাসমিতি, যাত্রা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এই যখন শহরের অবস্থা, তখন ছাতিম গ্রামে কেউ খবরের কাগজ পড়বে ও খবর রাখবে তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বাংলা মোশন পিকচারে মোশন দেখার মতোই দুরাশা। তাই ছাতিমবাসীরা জানতেও পারে না, তাদের গ্রামের নিশ্চিহ্ন ঠাকুরবাড়ির দীনদয়াল ঠাকুরের মূর্তি স্থাপিত ও উদ্বোধিত হতে চলেছে।

ছাতিম গ্রামে ঠাকুরদের ভিটে বর্তমানে সরকারে খাস। কারণ দীনদয়াল। দীনদয়াল ১৯২৪ সালে খড়গপুরের কাছে ট্রেন ডাকাতি করে টাকা লুঠ করতে গিয়ে ধৃত-বন্দীকৃত-নির্যাতিত ও শেষ অবধি নিহত হয় ফাঁসিকাঠে। সে কারণে পুলিশ তার বাপ-মা ভাই-বোনের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের গ্রামছাড়া করে এবং বাড়ি-ঘর-জমি বাজেয়াপ্ত করে। ছাতিমের লোকেরা খবরও রাখে না, দীন-দয়ালের মৃত্যুর সময়ে তার যে বোনের বয়েস দু-বছর ছিল, তারই শ্বশুর দীনদয়াল ঠাকুরের একমাত্র জীবিত আত্মীয় হিসেবে সরকার থেকে মাসোহারা পাচ্ছে।

বস্তুত, ছাতিম গ্রামের সঙ্গে দীনদয়াল ঠাকুরের যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাও ছাতিমবাসী প্রায় ভুলে গেছে। ল্যাটেরাইট মাটিতে ভাগচাষে ধান ফলান, জঙ্গলমহলে শাল গাছ ফেলিংয়ের ঠিকা কাজ করা, অবরে-সবরে মদন খাঁর ছেলে সদন খাঁর লাক্ষা চাষে মজুর খাটার

দুঃসহ সংগ্রামে তাদের জীবন কাটে। বিচ্ছিন্ন এবং চিরান্ধকার দরিদ্র গ্রামটিতে কিছুই নেই। কাছে কোনো হেল্থ-সেন্টার, গ্রামে কোনো জল-থাকা কুয়ো, এমন কি হাট, রাস্তাও নেই। গ্রামটি দেখলে মনেই হয় না, সাত মাইল দূরে উদ্ধত হাইওয়ে আছে। বিয়াল্লিশ মাইল দূরে খড়গপুর স্টেশন। চারপাশে আন্দোলিত ভূমি, নিচু পাহাড়, বামন শালের জঙ্গল, অসুমার দারিদ্র্য। হাটও সোম-শুক্রে বসে চার মাইল দূরে। নুন-মরিচ-চাল-মোটাকাপড়-জোলারগামছা দাদেরমলম ও দন্তশূল-প্লাস্টিকের খেলনা, তেলের সিঙাড়া ও গুড়ের জিলিপির হাট।

ছাতিম গ্রামে এবং অনুরূপ গ্রামে বুড়োদের চোখে ছানি পড়লে, প্রৌঢ়দের চোখে চালসে ধরলে, তারা হাটে আসে। তুফান মোল্লা চোখে নিকেলের স্বহস্তে তৈরি চশমা পরে অন্যদের চশমা বানিয়ে দেয় চার টাকায়। সুরেন হাতী পদ্মকাঁটা ও সজারুর কাঁটা দিয়ে ছানি কাটে। মাঝে-মাঝে হাটে এসে সরকারী আমলা চোঙা ধরে চেঁচিয়ে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তৃতা দেয় ও বিনামূল্যে উক্ত বিষয়ে বাংলা-হিন্দি-ইংরিজি সরকারী লিটারেচার বিতরণ করে। নিরক্ষর হাটুরেরা বই ও কাগজ হুড়োহুড়ি করে নেয়। মুদির দোকানে বেচে দেয়। ছবি পেলে মাঝে-মাঝে ঘরে নিয়ে দেয়ালে সেঁটে রাখে। তাদের ধারণা, বাপ-মা-ছেলে-মেয়ের সরকারী সুখী পরিবারের ছবিটি আসলে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, তদীয় স্বামী ও ছেলে-মেয়ের ছবি। এতেই বোঝা যাচ্ছে এরা কি পরিমাণ অন্ধকারে নিমজ্জিত। সে মহিলার ফ্যামিলি-স্ট্রাকচারও জানে না, এমনই অজ্ঞ।

দীনদয়াল ঠাকুর যে আসলে শহীদ, তাও ছাতিম গ্রামে সকলে জানে না। হঁ্যা, ঠাকুরের ভিটে আছে বটে। ঠাকুররা কেউই নেই। ভিটেটি পোড়ো। ভিটেতে একটা কুয়ো আছে, তাতে চৈত্র-বৈশাখে জল থাকে। কিন্তু সে জল কেউ নেয় না। গজাড় বন হয়ে গেছে চারপাশে। একটা ময়াল সাপ ওখানে থাকে। ছাগলছানা খেয়েছে দু-একটা। সাপটা কেউ মারে না। কেন? ঠাকুররা যাবার কালে

সাপটাকে ভিটে মুনতে বলে গেছে।

বস্তুত ছাতিম গ্রামের লোকেরা আগেও যে দরিদ্র ছিল, তা ভুলে গেছে। গ্রামটির চিরান্ধকার অবস্থার জন্য ওদের অনেকের চিরান্ধকার চেতনায় ঠাকুর-পরিবারের বিপর্যয়টি কারণ হয়ে আছে। ঠাকুর-পরিবারের গ্রাম ত্যাগ, দীনদয়ালের ফাঁসি ১৯২৪ সালের ঘটনা। কিন্তু চুয়াম্ন বছর আগেকার এই ঘটনাটি ওদের মনে অন্যান্য লোক-গাথার সঙ্গে আসন পেয়ে কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে আছে। অবশ্য সে বিষয়ে বিভিন্ন ভার্শান আছে।

ছাতিম গ্রামের বুড়ো সাঁওতাল মাঝি দাসু সোরেনের ভার্শান এই রকম,—'অনেক চাঁদ আগে এখান দিয়ে কর্ণাবতী নদী বইত। এখানে ছিল ভুঁইয়া রাজা। রাজার ছেলে নেই, মেয়ে নেই। তাতে রাজা আঁটকুড়ো বলে ভিখিরি ভিক্ষে নিত না। তাতে রাজার মনে দুঃখ হলো। রাজা রানীকে বললেন, চল, কর্ণাবতীর জলে ডুবে মরি। স্বামী আর স্ত্রী দু-জনে রাজ্যপাট ছেড়ে নদীর জলে ডুবে মরবেন বলে যাচ্ছেন আর যাচ্ছেন, পথ আর ফুরোচ্ছে না। রানী বললেন, দেখ গো। এ নিশ্চয় দেবতার মায়া। বাড়ির ছাত থেকে নিত্যি নদীর জল দেখি, পুজো-পার্বণে নদীতে চান করি, পথ তো এতখানি নয়? রাজাও মনে অবাক মানছেন। হঠাৎ দেখেন সামনে এক আশ্চর্য দেবী। সর্বাঙ্গে সাপের গয়না, মাথায় সাপের মুকুট, মাটি ছেড়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই রাজা আর রানী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। দেবী বললেন, আমি মনসা দেবী। আত্মঘাতী হোস নে, তোরা ঘরে ফিরে যা। ছেলে তোদের হবে। এখানে আমার থান গড়ে দিবি। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সেখানে সবাই যেন আমার ঘট রেখে যায়, ঘরে-ঘরে যেন আমার পুজো করে। তোরা কিন্তু বারোমাস আমার থানে নিত্যি পুজো দিবি, বামুন রেখে। রাজা বললেন, মা, জঙ্গলে রাজত্বি, বুনো রাজা। বামুন কোত্থেকে পাব? মনসা বললেন, উত্তর দিকে লোক পাঠাস সকালে। উত্তর বরাবর এক প্রহরের পথ হাঁটলে দেখবি, এক

গরীব বামুন বউ-ছেলে নিয়ে বট গাছের নিচে ঘুমোচ্ছে। বামুনের কপাল এতদিন মন্দ ছিল, এখন আমার কৃপায় কপাল খুলবে। বামুন খেয়ে-মেখে সুস্থ হোক। তারপর ও একদিনে তোর রাজত্বে যতখানি হাঁটবে, ততখানি জমি ওকে দিস। ওর অবস্থা ভাল হবে, তোরও ভাল-বই-মন্দ হবে না। বামুনকে মান্যি দিস, যেমন-তেমন নয়, কাশীধামের বামুন। সেই বামুনের বংশের ছেলে ছিল দীনদয়াল ঠাকুর। ভুঁইয়ারা এখন রাজত্ব খুইয়ে চাষী গেরস্ত, আর ঠাকুররা তো গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।'

এই কিংবদন্তীটি অহিন্দু সাঁওতালের মুখ থেকে বেরুবার কথা নয়। কিন্তু দাসু সোরেনই কাহিনীটি বলে। তার কাহিনীর প্রায় সবটুকুই আলৌকিক। তা থেকে দীনদয়াল ঠাকুরের ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনা বিষয়ে কলকাতায় বিবাদী বাগের টনক নড়ার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা মেলে না।

নাপিত রতন দাসের ভার্শান এই রকম :—'কর্ণাবতী বহুকাল হেজে-মজে গেছে। ভুঁইয়ারা কবে রাজা ছিল তা শুনেছি। ভুঁইয়া-বাড়িতে কার দেওয়া একটা তরোয়াল আর একটা পাট্টাও আছে। আমরা চিরকাল দেখেছি সদানন্দ ভুঁইয়া সম্পন্ন চাষী। তা সিলিং হবার পর কিছু নাই। এখন ওরাও বছরে চার মাস ধান কেনে। হ্যাঁ, ঠাকুররা ওদের পূজারী ছিল বটে। ওদের বাড়ির মনসা পুজত। গ্রাম ছাড়বার সময়ে সদানন্দের বাপ মহানন্দ ওদের বিগ্রহ নিতে বলেছিল, আর এ কথাও আমার বাপের কাছে শুনেছি যে, বিগ্রহ সেবা করার জন্যে মাসিক টাকাও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দীনু ঠাকুরের বাপ বলল, তোমার বিগ্রহ পূজা করে আমার কিছু ভাল হলো না হে, মায়ের কাছে মাপ চেয়ে আমি চললাম পূজা ছেড়ে। তখন মহানন্দ ভুঁইয়া বলে, ইনি যে-সে ঠাকুর নয়, মা মনসা। নরে নাগে বাস, বামুন হয়ে এঁরে চটাবে তুমি? ঠাকুর বলে ওনার পূজক হয়ে জীবনে পুলিশ ঢুকে গেল, ছেলে ফাঁসি গেল,

ভিটে-মাটি উৎখাত হলাম, পুলিশ আমার বউ-মেয়ের গায়ে হাত তুলল। এ হতেও মন্দ হবে? হোক। মা নাগ পাঠিয়ে আমাকে নির্বংশ করুক। তোমার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। এ হয়ে গেল কি জানেন? পূজকে-সেবকে আড়াআড়ি। না সে বিবাদ-বিরোধ তখনি শেষ। দীনদয়াল যখন মরে, এই সদানন্দ তখন আট বছুরা। সদানন্দের বয়স ষাট-বাষট্টি হবে, দেখলে বোঝা যায় না। খেয়েছে-মেখেছে খুব। ওর শরীরে কান্তি আছে। সদানন্দ মানুষটা গিমাগিজা। তবে ওর ছেলেটা, নবীন, ছেলে ভাল। পঞ্চায়েতে ওকে পাঠাব আমরা। ছাতিম বড় হতভাগা গ্রাম। সরকার ভুলে থাকে যে, ছাতিম নামে গ্রাম আছে। নবীন আমাদের ক্লাস এইট পড়েছে। মহকুমা টাউনে যায়, দরখাস্ত-আর্জি দেয় আমাদের হয়ে। তাতেই এ বছর বীজ-ঋণ পেলাম। ও চেষ্টা করছে গ্রাম হতে পাকা-রাস্তা বাস-রাস্তা তক্ নেবে। আমাদের এই সাতটা শাপা-তাপা হতভাগা গ্রামের জন্যে ছাতিমে হেলথ-সেণ্টার বসবে। ধান-ঋণ—কৃষি-ঋণ সেণ্টার করবে এখানে। সে অনেক টাকা। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর হাজা—র টাকার কাজ। ভাল ছেলে, নাচছে নাচুক। আমি জানি হবে না। গ্রাম চিরকাল রইবে এইরকম! আমি দেখি নি, বাপ দেখে নি, কর্তাদাদা দেখে নি কবে গ্রাম ভাল ছিল। দীনদয়াল ঠাকুর ফাঁসি যেতে ঠাকুরে-ভুঁইয়ায় যে মনান্তর হয় তা হতে গ্রামের পতন? না না না। চিরকা—ল পতন মশাই। আমি তো হাটবারে সেলুন দিই, খড়গপুরেও যাই, আর পাঁচটা গাঁ-গেরাম, এই তেমুখী গ্রাম কেমন হয়ে গেল! এম.এল.এ.-র গ্রাম। তা এম.এল.এ. যে হতভাগা হয়, আমাদের দেখে না। গ্রাম ভাল ছিল, দীনু ঠাকুর হতে মন্দ হলো, এ কথা যদি কেউ বলে, তো সদানন্দ ভুঁইয়া বলবে। ওদের আড়া-আড়ি কি নিয়ে, তা বলতে পারব না। আমরা তখন কত্টুকুন?'

রতন দাসের কথাতেও কিন্তু দীনদয়াল ঠাকুরের প্রতি প্রশাসনের সহসা নজর পড়ার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না।

সদানন্দ ভুঁইয়ার ভার্শান খুব টুইস্টেড ও হামবড়াইপূর্ণ। নামে 'তালপুকুর' হলে যা হয়! চারখানি মাটির ঘর, তুটি গোলাঘর, তিনটি হেলে বলদ এবং প্রচুর টানাটানির সংসার দেখিয়ে সে বলে যায়, 'এককালে, যত দূর দেখেন, সব আমার পূর্বপুরুষের ছিল। মানসিংগির নাম জেনে থাকবেন, তাঁর আমলে পরগণার উজীরকে আমার পূর্ব-পুরুষ সাহায্য করে, উজীর তাকে রাজা খেতাব দেয়। আরো কত কি! তরোয়ালটা আছে, শুনেছি হাতলে সোনার পাত ছিল, আমরা দেখি নি। পাট্টা আছে, পড়া যায় না। রাজাই বটি আমরা, তবে এখন খানায় পড়েছি, ও সব কথা বলে লাভ নেই। ছেলে তো রেগে যায়। বলে, রাজা ছিলাম, রাজা ছিলাম, তাতেই এত শাস্তি। পনেরো বিঘা এক-ফল্না জমির রাজা! বেটা খুব গিমাগিজা। মনে পাঁচ! ভাগচাষীর সঙ্গে হাতে চাষ করে বেটা! বিয়ে করে নি এখনও। বলে আয় নেই, বায় বাড়াব? ওর পরেরটা মানুষ হয়েছে। চাষবাসও করে না হাতে করে, বিয়েও করেছে, তুটো ছেলেও হয়েছে। কাজ? কাজ কি করবে, ফাইভ অব্দি বিত্তে। এখন আমাদের বাস্তু ঠাকুরের পুজোটা করায় মাসে-মাসে, পুরুতরা চলে যাবার পর থেকে দৈনিক তুধ-কলা-পিদিম-ফুল আমরাই দিই, মাসে-মাসে পুজোটা ওই ছোট-ছেলে সাইকেলে পাটকে গ্রাম থেকে বামুন এনে করায়। বড় ছেলের এ সব দিকে মন নেই। বেটা অতি তেঁইটে। বাউবী মরতে কাঁধ দেবে। ছোট ছেলের চলে কিসে? কেন? মনসার মেলাটা আমাদের আছে না? সেদিন যত হাঁস-পাঁঠা পড়বে, সবের ভাগ পাব, পনেরদিন মেলা চলবে, তার রোজগার আছে। রাজা হয়ে আজ আমাদের এ অবস্থা কেন? ওই দীনু ঠাকুরের জন্যে। খুব রবরবা ছিল আমাদের। ঠাকুররা আমাদের পূজারী বটে। কিন্তু ওদেরও পঞ্চাশ বিঘে জমি দেওয়া হয়েছিল। এখন ঠাকুর-ভিটে গজাড় জঙ্গল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এ—ই টানা দোতলা মাঠকোঠা চৌঘরি। আমাদের এখানে মাটি, শুকোলে, রোদ খেলে ঝামা। পঁচিশ বছরে

কিছু হয় না। টানা দালান, সার-সার ঘর। উঠোনের ওপারে গোলা-মরাই। রান্নাঘর, পুষকর্ণী, এখন শুকিয়ে কাঠ। এই বড় বাঁধান ইঁদারা। গোয়াল ঘর, বাড়ি ঘিরে ঘোড়াসিকের বেড়া। ফুলবাগান, পেছনে পেয়ারা-পেঁপে-আতা বাগান, ওদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা-করা রাধাগোবিন্দ, ঠাকুরবাড়ির শোভা ছিল কি! সবই আমাদের দৌলতে। সে মর্যাদা ওরা রাখল? নইলে এ তো সবাই জানে, ছাপা কেতাবও আছে, বারো আনা দাম, আমিই বেচি,—সবাই জানে, মা মনসা আমার পূর্বপুরুষকে বলে ওদের আনলেন ছাতিনে। গরিব ভিখিরি ছিল। তা মনে রাখল? আমার বাপ "হেই দেবতা, দোই দেবতা" বলল তাতেও ঠাকুর নিল না? নিজেদের রাধাগোবিন্দ নিয়ে গেল? পূজারী ঠাকুর ফেলে যায় কখনো? (কাহিনী এখানে পৌঁছলে সদানন্দ খুব বিচলিত হয় ও ঘন-ঘন ঘাড় মোছে)। তারপর বাবা গিয়েছিলেন পাটকে। নতুন পূজারী এনে প্রায়শ্চিত্ত পুজো করে, মায়ের মাপ চেয়ে তবে নতুন ব্যবস্থা হয়। ঠাকুরকুলে মা মনসা উগ্রচণ্ডী। তাঁর মনিয়াতে ঠাকুর পরিবারও ছারে খারে গেল, আমাদেরও মাইন্দার মরল সাপে কেটে। তারপর দেখুন, গাঁয়ে—পুলিশ কি জুলুমটা করে গেল। ঘরে-ঘরে জুলুম, মাথাপিছু পিটুনি বসাল, ভুঁইয়ারা ছাড়া সবাই গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। শেষ অব্দি, দীনু ঠাকুরের সেথো-সাথী হেথা কেউ নেই জানতে, পাটকের জমিদারের হাতি এনে ঠাকুর-বাড়ি ভুঁইসাইত করে। সব নিল খাস করে। ঠাকুররা একটা অজগরকে, মায়ের প্রাণী আর কি, ঘর মুনতে বলে চলে যায়। সেটা এখনো আছে। মাঝে-মধ্যে বেরোন ভিটে ছেড়ে, ধরেন ছাগলটা, মুরগিটা, ইয়া গজ-মোটা। আমার বাপের সঙ্গে দীনু ঠাকুরের বাপের আড়াআড়ি? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কুলোকের কু রটনা যত। দীনু ঠাকুর কি গাঁয়ে থাকত, যে তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কারো? আড়াআড়ি? না-না। ওই যে ঠাকুরের ছেলের ফাঁসি হলো, পুলিশ যে জুলুম করল, তাতেই দীনু

ঠাকুরের বাপের মনে কুসন্দ ঢুকল। টাউনের বদন খাঁ আর আমার বাপ, দুজনে ওর ছেলেকে ধরা করায়। তা যদি সত্যি হতো, তাহলে তো আমার বাপও বদন খাঁর সমান টাকা পেত! সব মিছে কথা। বয়সের ছেলে, তুমি শাসনে রাখ নি কেন? অন্যের কথা কি বলব। আমার বড় ছেলে নবনেটাও এসব কথায় প্রত্যয় যায়।'

সদানন্দ ভুঁইয়ার ভার্শানে দীনদয়াল ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু কথা জানা যায়। সব জানা যায় না।

নবীন ভুঁইয়ার ভার্শান খুব সংক্ষিপ্ত।

'হ্যাঁ, দীনদয়াল ঠাকুর শহীদ, তা জানি। শুনেছি ১৯২৪ সালে খড়্গপুরে ট্রেন লুট করতে গিয়ে ধরা পড়ে ফাঁসি যান। কোথাও বইয়ে লেখা থাকলেও থাকতে পারে। আমি জানি না। একটা রাস্তা দরকার আমাদের। এখনি। তাহলে গ্রামটার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ হয়। রাস্তার কথা বলে-বলে মুখে থুথু উঠে গেল। বলেছি, লেবার নিতে হবে না। সিকি লেবার চার্জে আমাদের সাতটা গ্রামের লোক রাস্তা করে দেবে। সাঁওতালরা তো হরদম লেবার খাটতে যায়। দাসু সোরেনরা সব জানে রোড লেবারের। ওরা লেবার দেবে। রাস্তা দরকার। তাহলে ঝপাঝপ গ্রামের যা-কিছু জিনিস, নিজেরা বাইরে নেওয়া যায়। হেল্‌থ-সেন্টারও চাই। এখনো সাপে কাটলে মা মনসা, কলেরায় বড়াম্‌ মা, জ্বর হলে জলপড়া ভরসা। সাত মাইল দূরে হেল্‌থ-সেন্টার। আমাদের গ্রামের পেছনেও তো আরো গ্রাম আছে। এখানে হেল্‌থ-সেন্টার হলে তাদেরও উপকার। বেশি নয়, জানেন, সত্তর হাজার টাকা হলেই একটা সাত মাইল রাস্তা হয়, হেল্‌থ-সেন্টার হয়, ঘর আমি দেব? প্রাইমারি স্কুল হয়। সরকারী মদত পেলে আমরা কর্ণাবতীর সোঁতায় আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরি দীঘিটা পাঁক কেটে জলসই করতে পারি। দীনদয়াল ঠাকুর? আমাদের পরিবারের সঙ্গে আড়াআড়ি? হয়েছিল বই কি। কারণও ছিল। কিন্তু কেন কি হয়েছিল তা আমি বলতে

পারব না। না। আমাকে জিগ্যেস করবেন না। সাপ? ওদের ভিটেতে? আরে, শীতকালে চিতাবাঘ থাকে, গজাড় জঙ্গলে সাপ থাকবে না? ঘর মুনতে বলে গেছে? কে জানে? যারা বলে তারা বোধহয় অজগরের কাছে গিয়ে শুনে এসে থাকবে। আমাদের রাজবাড়ি? দেখলেন না? মস্ত রাজবাড়ি, রাজা কোদাল মেরামত করছেন, রাজপুত্তুর ছেলে ঠ্যাঙাচ্ছেন। আমাদের গ্রামটায়, বুঝলেন সবচেয়ে দরকার আগে রাস্তা। স্কুল। লেখাপড়া। বর্ষায় কাদা ভাঙতে হয় বলে ছেলেরা যেতেই পারে না পাট্‌কে। রাস্তা হলে স—ব হবে।'

নবীন ভুঁইয়ার কথায় বোঝা যায়, অতীত নয়, বর্তমানেই ওর আগ্রহ। গ্রামের শহীদ বিষয়ে ওর আগ্রহ কম এবং ওর পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আড়াআড়ি বিষয়ে ও মুখ খুলতে নারাজ। ওর প্রধান আগ্রহ, কি করে সরকারকে দিয়ে সত্তর হাজার টাকা খরচ করিয়ে, মৃত ছাতিম গ্রামকে প্রাচীন ও বিংশশতকীয় কিংবদন্তী ও অর্ধ-সত্যের জগৎ থেকে তুলে এনে, একটি পাকা রাস্তার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। হেল্‌থ-সেণ্টার, স্কুল, রাস্তা বাস-সাইকেল-টেম্পো চলবে। অতীতে নবীনের আগ্রহ নেই।

একটি অতীতের মানুষে নবীনের আগ্রহ আছে। মানুষটি এক জরতী বৃদ্ধা। ভুঁইয়া-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে একটি একানে ঘরে এক বৃদ্ধা বসে থাকে। চেহারা পুরাণের মনসা বুড়ীর মতো। সাদা চুল, ছেঁড়া কাপড়, শীর্ণ দেহ। শুধু চোখ দুটিতে এখনো কি আছে, মনকে টানে। তার ঘরটি বেশ বড়। তাতে প্রশস্ত একটি মাচান। নবীন এ ঘরেই আসে। বছর দশেক হলো। তার আগে সেও বুড়ীকে ঢেলা মারত ও "ডাইনী" বলে পালিয়ে যেত।

তারপর সে জেনেছে বৃদ্ধা ডাইনি নয়। তারই পিসি। আপন পিসি। কোন এক সুদূর অতীতে এই পিসি, বিধবার সাদা কাপড় পরে দূর থেকে শিরীষ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিয়ের বর দেখার ফলে

অভাবিতপূর্ব সব ঘটনা জেনারেট করিয়েছিল। ফলে সে ভুঁইয়া বাড়িতে অলক্ষ্মীরূপে চিহ্নিত হয়। তাকে প্রাণে না মেরে উঠোনের ওপারে ঘর তুলে রাখা হয়। কেন না পিসির দুই ভাইবউ, নবীনের দুই জেঠিমা বলেছিল, অশুভ অলক্ষ্মী ননদের নিঃশ্বাসে তাদের ছেলে-পিলে মরে যাবে।

পিসি বসে খায় না। বনবাদাড় থেকে এই আটাত্তর বছর বয়সেও সে জ্বালানীর কাঠকুটো লতায় বেঁধে টেনে আনে ও উঠোনের ও-প্রান্তে রেখে দেয়। নবীনের মা অথবা বোন, পিসিকে মাসান্তে চাল-নুন-তেল ডাল দেয়, বছরে দু-খানা কাপড়। নবীন অন্তত তাই জানে। নবীনই তাকে মাথার তেল, বা গায়ের গামছা, সংসার থেকে এনে দেয়। শত কাজের মধ্যেও সে পিসির খোঁজ নেয়। তাতে বাড়ির সকলের প্রবল রাগ আছে। নবীনের মা ছেলের আড়ালে বলে, 'ডাইনি সংসারে ছাই ঢেলে এখন আমার ছেলেকে পর করছে।'

ওদের ক্রোধটা ওরা ইদানীং জাহির করতে সুবিধে পাচ্ছে। নবীনের সঙ্গে বাপের খিটিমিটির কারণে নবীন বাইরে-বাইরে ঘোরে বেশি ও আরেক শরিকের বাড়ি শোয়। ফলে চাল-ডাল পরিমাণে কমে ও অনিয়মিত হয় আজকাল। পিসি কোন প্রতিবাদ করে না। বহুদিন, বহুকাল যাবৎ ও, নিজের বিষয়ে অন্যদের আচার-আচরণের প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। খিদের কষ্টকে মেনে নিয়েচে ক্রণিক ও অমোঘ বাস্তবতা হিসেবে। বহুদিন আগে ও, সম্ভবত, মরে গেছে। জ্ঞান থেকেই তার মনে পড়ে, বাড়িতে সে ছিল একদিকে অবাঞ্ছিত, অন্যদিকে প্রয়োজনীয়। মার বছর বছর সন্তান হতো, সংসার ছিল মস্ত বড়। এখন যে সদানন্দ, বউ ও ছোট ছেলেকে নিয়ে তার ওপর নীরব অত্যাচারগুলি চালায়, কি আশ্চর্য, সেই সদানন্দ যখন জন্মায় তখন থেকে তারই কোলে মানুষ। মায়ের সূতিকা হয়েছিল। এখন ভাবতে গেলেও খুব অবাস্তব লাগে সব। সে কি এ বাড়ির কেউ? যদি আপনজন হবে, তবে ব্রাত্য কেন? যদি পর হবে,

তাহলে এ বাড়িতে কেন? যদি তাকে না-খেতে দেওয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তাকে দেয় কেন? যদি খেতে দেওয়া মন হয়, তাহলে এত কম পরিমাণে চাল দেয় কেন? খুবই জটিল প্রশ্ন সব। প্রশ্নগুলি নিয়ে ও মাঝে-মাঝেই জাল বোনে মনে-মনে, সে জালে বন্দী হয় নিজে এবং হাল ছেড়ে দেয়।

মাঝে-মাঝে তাকে খুব ব্যস্ত দেখা যায়। নেসেসিটি না-কি ইনভেনশনের জননী। তা, সেই নেসেসিটির তাগিদে ও অনেক কাজ করে। ওর ঘরের এক কোণে মেঝে খুঁড়ে কুণ্ড করা আছে। তাতে ও আগুন জ্বালায়। কাঠ পুড়িয়ে কাঠকয়লা করে। কাঠকয়লা জ্বেলে ও আগুন জ্বালায়। কারণ দুটি। প্রথম কারণ হলো, একটা দেশলাইয়ের বাক্স ওর সাধ্যের বাইরের বিলাসিতা। ও হাতে কখনো কোনো পয়সা পায় না, তাই দেশলাই কেনার কথা ওঠে না। নবীনের খেয়াল হলে দেশলাই, মাথার তেল ইত্যাদি ওকে দিয়ে যায়। কিন্তু খেয়াল হয় ওর মাঝে-মধ্যে। রেগুলার খেয়াল হয় না এবং তাও তার মনে থাকে না। অতএব, ও বুঝেছে, দেশলাইয়ের বাক্স কৌটোয় রেখে, আগুন জ্বাইয়ে রাখা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বিতীয় কারণ হলো, না-খেয়ে ও সিকি-পেটা খেয়ে-খেয়ে শরীরে আর কিছু নেই। আগুনের তাপ ওর ভাল লাগে এবং রক্ত নেই বলে সদাই ওর শীত করে। বৈশাখে-জ্যৈষ্ঠেও ও আগুনের ধারে বসে থাকে রাতে।

নবীন বলে, 'তুমি পাগল?'

'কেন? কি করলাম?'

'এই তাত, এই গরম, আগুন ধারে বসে আছ?'

'তাত?'

ওর গলায় 'তাত' শব্দটি বিপন্ন ফুলের মতো ফুটে ওঠে ও ঝরে পড়ে। চোখ দুটি হয়ে যায় নিষ্পাপ ভোরাই তারা এবং পলাতকা। এক ক্ষণমুহূর্তের জন্য ওকে খুবই সুন্দরী দেখায়। নবীন আশ্চর্য মমতা ও

আকর্ষণ বোধ করে। বলে, 'খুব তাত পিসি। শরীরে কিছু নেই বলে তোমার শীত লাগে অত।'

মাঝে-মাঝে দেখা যায় ওকে ঠাকুর-বাড়ির ঘন গজাড় জঙ্গলে ঘুরতে। দেখা যায়, মানে অজগর সাপটি দেখে। এক সময়কার ফলবাগানও আজ জঙ্গল। ও কিন্তু প্রাণধারণের অসম্ভব তাগিদে সেই জঙ্গল থেকেই পাকা নোনাটা, আমড়াটা, আমলকীটা আনে। নবীন জানে, পিসি যা পায়, তাই খায়। জেনে তার মনে নানা বিমিশ্র অনুভূতি হয়। রোজগারী হলে বাপকে ড্যাং মেরে পিসিকে নিয়ে টাউনে চলে যাব। রোজগারী নই, কিন্তু কোনদিন কি হব না? এখনো বাপের ঘাড়ে খাই। চিরকাল খাব না। পিসি এত কষ্টে এতকাল বাঁচল, অন্য কেউ হলে মরে যেত। পিসি কি আর ক'বছর থাকবে না?

মাঝে-মাঝে দেখা যায়, ও মনসাথানে ঘুরছে। নানাভাবে ও ওর জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করে থাকে। মনসাথানে মাঝে-মাঝে কেউ মানসিক করে মেটে হাঁড়িতে দুধ-জল রেখে যায়। হাঁড়িগুলি ও সংগ্রহ করে। কারণ একটাই। একদা ওকে আলাদা করে দেবার সময়ে একটা ভাতের হাঁড়ি দেওয়া হয়, কড়াই। সে হাঁড়ি-কড়াই বহুদিন চুলোয় গেছে। এইভাবে হাড়ি সংগ্রহ করে ও বাসনের সমস্যা সমাধান করে। হাঁড়িগুলি মনসার, যে মনসা তারই কুলদেবতা। এসব কথা ওর মনেও হয় না। নবীনের কাজ হলে ওকে হাঁড়ি-কড়াই কিনে দেবে বলেছে।

মাঝে-মাঝে দেখা যায়, চৈত্র মাসে, ঠিক সন্ধ্যের মুখে ও গ্রাম থেকে বহু দূরে, সে কারো ক্ষেত থেকে পটাপট মাষকলাইয়ের ফলন্ত ডাল ছিঁড়ছে। কারণ একটাই, খাদ্যসমস্যার সমাধান।

তখন ওকে খুব অপার্থিব দেখায়। শীর্ণ দেহ. সাদা চুলে চৈত্রি বাতাস, চোখে একটি আবিষ্ট দৃষ্টি। আবিষ্ট দৃষ্টিটি মাঝে-মাঝেই দেখা যায় ও নবীন খুব উদ্বিগ্ন হয়। ভাবে, পিসি জন্মভোর অবিচার সইল,

সে সব কথা ভাবছে বোধহয়। ও কিন্তু অতীতের কথা ভাবে না। নবীন যেমন বর্তমানে বিশ্বাসী, ও নিজেও তাই। স্বপ্নাবিষ্টচোখে ও ভাবে, মাষকলাইয়ের দানা বেছে আঁচলে বেঁধে রাতে যখন শোবে, তখন কতক্ষণ ধরে অন্ধকারে সেগুলি খাবে। বস্তুত, ওর সব চিন্তাই উদর-কেন্দ্রিক। স্বপ্ন যখন দেখে, সেও খুব রূঢ় স্বপ্ন। স্বপ্নে ও আস্ত কাপড় পরে একটা কাঁসার থালায় একথালা ভাত খায়। রোজ। শুধু ভাত। ডাল নয়, তরকারি নয়। শুধু ভাত।

দীনদয়ালের ১৯২৪-এ শহীদ হওয়া, ঠাকুর-পরিবার উৎখাত হওয়া, ভুঁইয়াদের সঙ্গে তাদের আড়াআড়ি হওয়া, ১৯৭৮-এ কলকাতায় দীনদয়াল বিষয়ে নতুন কৌতূহল জাগ্রত হওয়া, সব কিছুর মূলেই ও। সেকথা ওর মনে থাকে না। যেমন মনে থাকে না ওর নাম ছিল ব্রজদুলালী এবং একসময়ে ও ছিল ফুলে-ভরা কামিনী গাছের মতো নম্র ও বিকশিত।

কেউই ওর কাছে জানতে চায় নি, কিন্তু একা ও পারে দীনদয়ালের শহীদ হবার পেছনের অলিখিত কাহিনী বলে দিতে।

খুব ক্বচিৎ কখনো ও মনসা-মেলার হৈ-চৈ ছেড়ে চলে যায় কর্ণাবতীর পরিত্যক্ত সোঁতায়, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, আকাশে যখন নীলাঞ্জন ছায়া, সোঁতার বুকে বনশিউলীর ফাঁকে-ফাঁকে প্রফুল্ল কদম্ব বন। কেন যায়, তা ও বলতে পারবে না। একটি চ্যাটাল পাথরে ও বসে থাকে। তখন ওকে দেখে মানুষ মনে হয় না। ছোটবেলায় বাপের কাছে শোনা কাহিনী মনে পড়ে। 'এক সময়ে, এস—ব আমাদের ছিল। কর্ণাবতীতে তখন সম্বচ্ছর অগাধ জল থাকত।' ওর শীর্ণ শরীরে কদম ফুলের রেণু ঝরে। ও ভাবে-আর-ভাবে। তারপর ভুঁইয়া-বংশের অতীত গৌরব ভুলে গিয়ে ভাবে, 'কদম পাকলে খেতে বেশ। কুড়িয়ে নিয়ে যাব। টক কদমে নুনের টাকনা দিয়ে ভাত খাব।'

ও জানে নি, ওকে প্রথমে কেউ বলে নি, দীনদয়াল ঠাকুরের মূর্তি ছাতিম গ্রামে স্থাপিত হতে চলেছে।

॥ ২ ॥

শহীদ দীনদয়াল ঠাকুরের প্রতি, ফাঁসির চুয়ান্ন বছর বাদে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ হবার পেছনে প্রধান অবদান জনৈক বা একাধিক নেংটে-ইঁদুরের এবং এক 'নেই কাজ তো খই ভাজ' মানসিকতাসম্পন্ন ফিচেল ছোকরা জেল-কেরানীর এবং সশস্ত্র ইংরেজবিরোধী বিংশ-শতকীয় বিপ্লবের সারাৎসার তৈরি করার দিকে গবেষকদের প্রবণতা। উদ্দেশ্য ডক্টরেট লাভ।

এক গবেষক মেদিনীপুর জেলার সশস্ত্র বিপ্লবেতিহাসের অবহেলিত ঘটনাগুলি নিয়ে ডক্টরেটের থিসিস করতে যায়। সেই সঙ্গেই, জেল-রেকর্ডও ঘাঁটতে থাকে। তার মাসতুতো ভাই, এক জেল-কেরানী আবিষ্কার করে, ১৯২০—১৪ সালের বেশ কিছু রেকর্ড নেংটেরা কাটছে। মাসতুতো ভাইয়ের অনুরোধে সে সেই ইঁদুরে-কাটা কাগজ-পত্র থেকে যা-যা উদ্ধার করতে পারে, সব লিপিবদ্ধ করে।

এইভাবেই সে আবিষ্কার করে, শহীদ দীনদয়াল ঠাকুর ছিল মেদিনীপুরের ছাতিম গ্রামের বাসিন্দা। সে একটি দীর্ঘ চিঠিও পেয়ে যায়। দীনদয়াল লিখিত। ফাঁসির আগে-আগে। চিঠিটিতে দেশ-মাতৃকা-রক্তদান—নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতি ইত্যাদি প্রত্যাশিত কথাবার্তা সবই থাকে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, চিঠিটি মাঝ-পথে আসার পর দেশ-সন্ত্রাসবাদ-গীতার বাণী ইত্যাদি চলে যায় কোথায়। দেড়পাতা ধরে এসব কথার পর, বাকি সাড়ে-ছয় পাতা ধরে চিঠিটি যার নামে লেখা, সেই "দুলালী"র প্রতি প্রেমের স্বীকারোক্তি। যেমন—

"যদি জানতাম, যদি সাহস খুঁজে পেতাম, তাহলে তোকে নিয়ে চলে যেতাম। তুইও যে ভয় পেয়ে গেলি দুলালী। সব কথা অস্বীকার হলি। আজ আমি পরপারের আহ্বানে সাড়া দিতে চলেছি, তোকে যদি নিয়ে যেতে পারতাম।

কে বলেছে বিধবা হলে তার জীবন শেষ হয়ে যায়? কে বলে ভুঁইয়াতে-ঠাকুরে বিয়ে হয় না? দুলালী, দুলালী, তোমাকে একবার দেখলে আমার কোনো খেদ থাকত না, আজ বাদে কাল ফাঁসি। আপীল আমি করি নি, করব না। কিন্তু পরপারে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব, যতদিন না তুমি ও আমি মিলিত হই।"

তারপর লেখা আছে, "তুমি ও আমি তো কিছুই চাই নি, শুধু পরস্পরকে। তাও দিল না এই হৃদয়হীন সমাজ। আমি তোমাকে ডাকি, দুলালী। দুলালী। দুলালী। তুমি শুনতে পাও?

"একদিন কর্ণাবতীর সোঁতায়, পাথরেবসে তুমি বলেছিলে, দীনুদা, এস দু-জনে বিষ খাই। কিন্তু সাহস হয় নি। দুই পরিবারে কলঙ্ক হবে বলে আমরা সে কাজ করি নি। আজ মনে হয়, কেন করলাম না? এই পত্র কি তোমাকে ওরা দেবে? কে জানে? দুলালী,··· এখন মনে হয়, তোমাকে চিরদিনই ভালবাসতাম, নিজের অন্তর জানি নাই বলে এত কষ্ট পেলাম বা দিলাম।"

চিঠিটি থেকে দুটি জিনিস বোঝা যায়। দীনদয়াল ঠাকুর এই "দুলালী"কে ভালবেসে গ্রামসমাজে প্রবল কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সে এই মেয়েটিকে ভালবাসত। মনে হয়, প্রেমে অচরিতার্থতা এবং বিপ্লবী কাজে যোগদান হয়তো পরস্পরনির্ভর।

গবেষকটি খুবই আগ্রহী হয়। সে দীনদয়াল বিষয়ে সরকারী রিপোর্ট পড়ে।

আসামীর বয়স চব্বিশ, উচ্চতা পাঁচ-এগার, রং ফরশা, চুল তামাটে ও ছোট করে ছাঁটা। ব্রাহ্মণ, গলায় উপবীত আছে। ইংরিজি মোটামুটি জানে, বাংলা ভালই। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং পুলিশ-থানা-হাজত-লালবাজার, কোথাও তাকে দিয়ে কথা বলানো যায় নি।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে সন্ধ্যা সাতটায় দীনদয়াল ঠাকুর, রমণী সাঁতরা ও সরদেব পাণ্ডা ৩১৩ আপ ট্রেন দাঁড় করায় খড়গপুরের অনতিদূরে, (ট্রেনটিতে ডাকের টাকা যাচ্ছিল) এবং 'বন্দেমাতরম্'

বলতে-বলতে গার্ডের কামরায় ঢোকে। দীনদয়াল বলে, 'দেশমাতৃকার কাজে আমরা টাকা নিচ্ছি। যে টাকা আমাদের শোষণ করে বিদেশী সরকার নিয়েছে, অতএব বাধা দিও না।'

এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার ফলে (১) ডাকাতদের টেররিস্ট বলে ক্যাটেগরাইজ্ করা যায়; (২) কিঞ্চিৎ সময় যায়; (৩) সশস্ত্র শান্ত্রী বন্দুক ফুটোতে সময় পায়; (৪) ফলে দীনদয়ালের গুলিতে শান্ত্রী ও গার্ড জখম হয়। কিন্তু এর মধ্যেই বিপর্যয় ঘটে। ওই ট্রেনেই ছিলেন কলকাতার এক মার্চেন্ট আপিসের চারজন সায়েব। উড়িষ্যায় তাঁরা শিকার করতে যাচ্ছিলেন বলে কাছে বন্দুকও ছিল। তাঁরা রঙ্গমঞ্চে সশস্ত্রে প্রবেশ করেন ও তিন বিপ্লবীকে অ্যারেস্টিংয়ে সহায়তা করেন। খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, তিনজনই নখে-দাঁতে বাধা দেয় ও দীনদয়াল সহসা কি করছে তা কেউ বোঝার আগেই নিজের রগে রিভলবারের নল চেপে আত্মহত্যা করতে যায়। এক সাহেব তার হাতে ঝট্‌কা মারতে গুলিটি তার পাঁজরে বিদ্ধ হয়। জখম অবস্থাতেই তাকে খড়গপুর রেলের হাসপাতালে নিতে হয়, অন্য দু-জনকে মেদিনীপুর জেলে। শেষ অবধি দীনদয়ালকে কলকাতায় নিতে হয়। সেখানে প্রথমে তার গুলিজনিত ক্ষতটি আরোগ্য করা হয়। তারপর, বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তি করাতে পারঙ্গম বলে খ্যাত তিনজন অফিসার প্রাণপণ চেষ্টা করেও দীনদয়ালের মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে অক্ষম হন। তবে আর দুজন বয়সে কম, তাদের যথোচিত দৈহিক খোঁচাখুঁচি-সূচবেঁধানো-পেরেক-সোল্ বুটে-মাড়াই ইত্যাদি করে খবর বের করা যায়। দীনদয়াল ঠাকুর বরাবর বিপ্লবীদলে ছিল না। ১৯২৪-এর আগস্টের রংরুট। আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের তিন তারিখের মধ্যে সে ওই অঞ্চলে দুটি পোস্টাপিস লুঠ করেছে এবং ট্রেজারী গার্ডের বন্দুক ছিনতাই। সে অরাজনীতিক ছাতিম গ্রামের ছেলে। অতঃপর সংক্ষিপ্ত বিচার হয়। টেররিস্ট আন্দোলন বাংলায় হচ্ছে গোপীনাথ সাহার টেগার্ট ভ্রমে অন্য শ্বেতাঙ্গ

হত্যাতেই প্রমাণিত। এই সময়ে দীনদয়ালের খবরকে যথেষ্ট প্রচার করতে টেগার্ট বারন করেন। বলেন, একটা ঘটনা অন্য ঘটনাকে ট্রিগার করবে। ট্রাই অ্যাণ্ড হ্যাং হিম অ্যাজ অ্যান অর্ডিনারী ক্রিমিনাল। "ট্রাই" করার আগেই "হ্যাং" করার নির্দেশ থাকায় বিচারকের কাজেরও সুবিধে হয়। দীনদয়াল ধরা পড়ে ৯ই, ৩০শে তার ফাঁসি হয়। সে মৃত্যুদণ্ড শুনে খুবই স্বস্তি পায় এবং সন্ত্রাসবাদীদের অভ্যস্ত ভয়হীনতায় ফাঁসি যায়। ফিউনেরাল বাই পোলিস্। দীনদয়ালের ফাঁসি হয়ে গেলে, জানুয়ারির মাঝামাঝি ছাতিম গ্রামে পুলিশ যায়।

গবেষকটি খুব উৎফুল্ল হয়। শহীদ, শহীদ বলে সরকারের এত খোঁজাখুঁজি, এই তো এক শহীদ। সে প্রশাসনকেও আগ্রহী করে। ফলে ১৯১৯-এ এক বাহাত্তুরে বুড়ো নিজেকে দীনদয়ালের একমাত্র জীবিত আত্মীয় বলে প্রমাণ করে সরকারী পেনশন পেয়ে যায়। গবেষকটি তার বই বের করে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে, বিয়েবাড়িতে লুচি দেবার ভঙ্গীতে তাকেও বহুজনের সঙ্গে ডি. ফিল. প্রদান করা হয়। যেহেতু তার বই বিক্রি হয় না, সেহেতু সে নিজেই বই বিতরণ করতে থাকে সর্বত্র। নিজের পয়সায় ছাপান বই, তাই কোনো অসুবিধে হয় না। তার বই জনৈক মন্ত্রীর দপ্তরেও পৌঁছয় এবং মন্ত্রীর পি. এ. বইটি পড়ে ইলেকট্রিফায়েড হন। শহীদ, জেনুয়িন শহীদ, বিপ্লবের অন্যতম ধাত্রীভূমি মেদিনীপুরের শহীদ, অথচ তাকে নিয়ে কিছু করা হয় নি? সে মন্ত্রীকে দীনদয়ালের মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হয়। যেহেতু মৃত ব্যক্তির মূর্তি অন্যান্য জীবন্ত সমস্যার চেয়ে অনেক প্রয়োজনীয়, সেহেতু মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্তে কোনো মতপার্থক্য ঘটে না।

এই স্টেজে সদন খাঁ প্রবেশ করে। তার ঠাকুর্দা ১৯২৪-এ ৯ তারিখে ৩১৩ আপে প্যাসেঞ্জার ছিল। ধরা পড়ার সময়েই বদন খাঁ দীনদয়ালকে সনাক্ত করে এবং লেটার স্টেজে কলকাতা গিয়ে পুলিশকে সাহায্য করে। সেই থেকেই তার বেস্পতি তুঙ্গী এবং সেই কারণেই তদীয় পুত্র মদন

খাঁ স্বাধীনতার পর দেশপ্রেমী বলে চিহ্নিত হয়। এখন সদন খাঁ কিভাবে খবর পেয়ে চলে আসে ও মূর্তির ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়।

সামান্য গণ্ডগোল দেখা দেয় মূর্তি কি দিয়ে গড়া হবে তা নিয়ে। পাথর নয়। কেন না পাথরে গড়া মূর্তির কারণে বীরসিংহের সিংহ-শিশুও স্বমুণ্ড রক্ষায় সক্ষম হন নি।

পাথর না হলে কি, মাটি ?

সদন বলে, 'মাটির মূর্তি না-ঢাকলে জলে গলবে, ঢাকলে কুই পোকার বাসা হবে।'

'ব্রোঞ্জ ?'

এই স্টেজে কে ঠাট্টা করে বলে, 'ব্রোঞ্জই ভাল। ভেঙে-ভেঙে বেচলেও টাকা।'

এ কথায় সদন খাঁ খুব দুঃখ পায়। 'অ্যাঁ ? এ কি বললেন ? দেশের সুসন্তান, তাঁর মূর্তি ভেঙে কে বেচবে ? আমরা মফস্বলের মানুষ বলে কি অমানুষ ?'

অতএব ব্রোঞ্জে মূর্তি গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। সদনের চেষ্টায় পাট্‌কে সুরাজমোহিনী বয়েজ স্কুলের ১৯১৮ সালের একটি স্কুল-ম্যাগাজিন মেলে। তাতে স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া দীনদয়াল ঠাকুরের ফটোও মেলে। সেই ফটো দেখিয়ে মূর্তিকারকে বলা হয়, 'এখানে বয়স আঠার, মূর্তিতে বয়সটা ছ' বছর বাড়িয়ে দেবেন।' এ কথা শুনে মূর্তিকার খুবই ভিরমি খায়। কিন্তু সে কিছুই বলে না, কেন না কনট্রাক্ট ফসকে গেলে তারই ক্ষতি। সে 'ইয়েস সার' বলে চলে যায়।

সদন খাঁ শহরে ফিরে যায় ও নবীনকে পাকড়ে সুসংবাদটি দেয়। বলে, 'কেভাবে তুলী পিসিকে লেখা চিঠিও ছেপে দিয়েছে শুনলাম। কাগজের লোকজন শুধোতে পারে।'

'কি শুধোবে ?'

'ভেবে দেখ। বাপ মা থাকতে মরার আগে দীনু ঠাকুর তোমার পিসিকে বা চিঠি লিখল কেন ?'

নবীন গ্রামে এসে খবরটি দিতে তার বাপ খুবই ক্ষেপে গেল। নবীনও তেতে উঠল।

'চট কেন?'

'না, নাচব।'

'চটলে কেন?'

'বাড়ির সঙ্গে তোমার তো ভাতের সম্পর্ক। বাড়ির কেচ্ছা আবার দশ কান হবে, তাতে চটব না?'

'বাবা, দিনকাল তেমন নেই।'

'গ্রামে বাপু তেমনই আছে।'

'না না, কোন গোলমাল হবে না।'

'হবে না?'

সদানন্দ টাউনে যেতে সদন খাঁও বলল, 'তুমিও যেমন! খবর নেবে রিপোর্টার। তাদের বলে দেবে উনি কাকে চিঠি লিখেছিল সে আমরা জানি না। ঢুলী পিসিকে সরিয়ে রেখ। ও যেন কারও সামনে না আসে। তাহলেই সব চাপা পড়বে।'

'বিভীষণ রয়েছে ঘরে, নবীনচন্দর?'

'তাকে বুঝিয়ে বলে দেব।'

নবীন এবার সত্যই চটল। বলল, 'কিছু চাপব না। তখন কেলেঙ্কারী হয়েছিল, এখন সেকথা কেউ মনেও করবে না। আপনি টাউনে বসে হুকুম চালালে তো হবে না। আমি ওদের সঙ্গে তাল-রেখে চলব। পাকা সড়ক একটা না হলে সাতটা গ্রাম অন্ধকারে পড়ে থাকে। পাঁচজন কাঁধ না দিলে সে কাজ হবে? খবরের কাগজে লিখলে-টিকলে আজকাল কাজ হয়।'

যাকে নিয়ে এত কথা, সে তখন কর্ণাবতীর মরা সোঁতায় পাকা আমলকী খুঁজছিল। কাঠ-কুটোর বাণ্ডিলটি লতা দিয়ে বেঁধে সে টানছিল স্থান-থেকে-স্থানান্তরে। নবীন সাইকেল নিয়ে খুঁজতে-খুঁজতে ওকে সেখানেই পেল। হেঁকে বলল, 'পিসি।'

'কে, নবীন ?'

'গজাড়বনে কি করছ ?'

'পাকা আমলকী রে, খাবি একটা ?'

'তুমি উঠে এস তো।'

কাঠের বোঝা টেনে-টেনে পিসি উঠে এল। নবীন বলল, 'এখেনে বোস।'

'কেন ?'

'কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে ?'

'তোমার সঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গে কথা কই বাড়িতে ? মানুষ নাকি ওরা ?'

'কেন রে ? বাপ বকে ?'

'যাক গে ওদের কথা, বোস।'

পিসিকে হাত ধরে বসাল নবীন। বলল, 'এত চেষ্টা করছি, কাজ কি পাব না পিসি ? যা হয় তা পেলে তোমার ভাইয়ের মুখে ড্যাং মেরে তোমাকে নিয়ে চলে যাব।'

'তোর এই এক কথা।'

'তোমার জন্য কি এনেছি বল তো ?'

'মাথার তেল ?'

'এঃ, ওটাই ভুল হয়ে গেল।'

'তা যাক্ গে।'

নবীন ওর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিল। টাউনের বাজারে সাত টাকায় কেনা। জ্যালজেলে চাদর, সুতো বলতে নেই। কিন্তু পিসির পরনে ত্যানা-কানি, নবীনের সাধ্যের দৌড়ও বেশি নয়। পিসি যেন স্বর্গে হাত পেল।

'হ্যাঁ নবীন, আমার জন্যে ? ও মা, কেমন রং, কেমন ওম্, কেমন নতুন-নতুন গন্ধ দেখ্ ?'

'দেখেছি। এই নাও।'

'কিসের কৌটো রে?'

'বাতের মলম। বাসে বেচছিল। নিত্যি তো হাঁটু-কোমরের ব্যথায় কাতরাও।'

'টাকা পেলি কোথা? বাপ দিল?'

'দূর! টাউনে যাচ্ছি কি এমনি? পার্ট্-কের মুরারিবাবুর প্রেস আছে না? একটু-একটু কাজ শিখছি।'

'বাপ কিছু দেয় না, তাই না?'

'না। আছেই বা কি?'

পিসি আস্তে বলল, 'অথচ সম্পত্তিটাই দেবত্তরী। সদার যত ভাগ, তোরও তত, ভাইয়েরও তত।'

'না পিসি, ওদের আমি কিছু চাই না।'

পিসির হাতটা হাতে নিয়ে নবীন কিছুক্ষণ বসে রইল। শীত-কালের বেলা তিনটে। নদীর সোঁতায় বালি উড়ছে। দূরে মোষের গলায় ঘণ্টা বাজছে। দাসু সোরেনরা সোঁতায় রবি আজ্জায়। চারি-দিকে আন্দোলিত ল্যাটেরাইট জোন, বামন-শালের বনে পাতা ঝরার শব্দ। উদাস-উদাস, মন খারাপ-করা অপরাহ্ণ। নবীন এই নিস্তব্ধ ঔদাসীন্যকে পাকা সড়কে বেঁধে বর্তমান সময়ের কোলে নিয়ে যেতে চায়।

পিসির সাদা চুল, মুখে কোমল ও করুণ নিঃসঙ্গতা, মুখটি শীর্ণ, চামড়ায় রেখা। দীনদয়ালের চিঠিতে পিসির সরু কোমর ভেঙে দাঁড়াবার ভঙ্গীর কথা, আশ্চর্য রূপের কথা লেখা আছে। নবীন শহরে পড়ে এসেছে। এখন যে কথা পিসিকে বলবে, তা বলা বড় নিষ্ঠুরতা। কিন্তু নবীন যে-সময়কে ছাতিম গ্রামে আনতে চায়, সে সময় বড় নির্মম ও ক্ষমাহীন। রিপোর্টাররা পিসিকে ছেড়ে দেবে না।

'পিসি একটা কথা।'

'বল।'

'দীনু ঠাকুরকে তোমার মনে পড়ে?'

পিসি নিরুত্তর। অসহায় চোখ দুটি সে নবীনের চোখে রাখল ও নবীন সবিস্ময়ে এই প্রথম লক্ষ্য করল, পিসির বয়স আটাত্তর হলেও, চোখ দুটি এখনও সজীব।

'মনে পড়ে পিসি?'

'পড়ে।'

'দীনু ঠাকুরের নাম বইয়ে উঠেছে পিসি।'

'কোথা?'

'আমার কাছে নেই।'

'তাহলে?'

'তোমার নামও।'

'আমার নাম।'

'দীনু ঠাকুর ফাঁসি যাওয়ার আগে তোমাকে চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি বইয়ে ছাপা হয়েছে।'

'কি হবে নবীন?'

'কিসের কি হবে?'

'তোর বাপ তাড়িয়ে দিলে কোথা যাব?'

'কেউ তাড়াবে না। শোন।'

'বল্।'

'দীনু ঠাকুরের মূর্তি বসবে গ্রামে।'

'কোথা?'

'ওদের ভিটে পরিষ্কার করে, সেথা।'

'কবে?'

'শুনচি তিন মাসের মাথায়। তখন লোকজন আসবে, তোমাকে দু-কথা শুধাতে পারে।'

'আমি কি বলব?'

'যা মনে হবে বলবে।'

'তোর বাপ···'

'আমারও হক আছে পিসি, তুমিই তো বললে। তোমাকে কে কি বলবে? যদি বলে, তুমি, আমি টাউনে চলে যাব, না খেয়ে মরি-বাঁচি দেখব।'

'নবীন···'

'বল।'

'তখন তোর জ্যাঠা আমার চে ছোট, মরে গেছে এখন,···আমাকে খুব মেরেছিল। সেই হতে যত দুর্ভোগ আর লাঞ্ছনা···সবাই তো ভুলে-মেলে গিয়েছিল, আবার···।'

'পিসি! তখন কি হয়েছিল মনে রেখ না।'

'কত বছর হল?'

'চুয়ান্ন।'

'চুয়ান্ন। এতদিন হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ পিসি।'

'তোর বাপ তো কিছুই জানত না। তখন এতটুকুনি ছেলে। সেও বড় হয়ে···তোর মা···এক কোণে পড়ে আছি গরু-ছাগলের চেয়েও অবলা হয়ে।'

'জানি।'

'আজ, এতকাল বাদে···'

'ভেব না তো। কেউ কিছু বলবেও না। আমি পঞ্চায়েতে থাকছি। আমার কথার একটা মান্যি তো আছে গ্রামে? কেউ কিছু বলবে না। নাও, বাড়ি চল।'

'চল্।'

'ওঃ কেবল ভুলে যাচ্ছি। এই নাও।'

'কি রে?'

'ছাতু পাঁচশো আর ভেলি গুড়।'

'বেঁচে থাক ধন, রাজা হও।'

'রাজা আর রানী। তোমায় আর হাততুলে ভাতও দেয় না। তার পরেও রাজা হতে বল?'

'নে, রাজা হোসনে্ তবে।'

'পিসি, ঠাকুর-বাড়ির সবাইকে পুলিশ তুলে দেয়?'

'দিয়েছিল। আর…'

'কি?'

'ঠাকুর জ্যাঠা আমার ওপর রেগে…'

'থাক, কেঁদ না।'

'তোর বাপকে বলিস নবীন, যেন আর লাঞ্ছনা না করে। আমি নয় এই নদীর সোঁতায় বনের মধ্যে থাকব একখানা ঘর তুলে।'

'কেবল এক কথা, ছাড় তো।'

॥ ৩ ॥

ও ভেবেছিল, কিছুই মনে নেই। কিন্তু রাতে ঘরের ঝাঁপ টেনে মাচানে শুতে সব মনে পড়ল। কেমন করে? মনে থাকার তো কথা নয়। সেই এক ঘটনা থেকে ওর জীবনে যত বিপর্যয়। সেই জন্যই কি ও কিছুই ভোলে নি? কত দিন, কত বছর, সব চাপা পড়ে গিয়েছিল কোথায়। নবীন উত্তুরে বাতাস হয়ে এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল আজ।

কবেকার, কবেকার কথা?

দু-জনেরই জন্ম এই শতকের সঙ্গে। দু-জনেই একবয়সী, বিংশ শতকের। কিন্তু বিংশ-শতক ওদের বন্ধু করে নেয় নি। ওদের মধ্যযুগে ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ও বুঝল, ও যাদের কথা ভাবছে, তাদের সেদিনের মন, সেদিনের ভালবাসার সঙ্গে এক হওয়া আজকের রাতেও আর সম্ভব নয়। আটাত্তর বছরে পৌঁছলে শরীর এমন হয়, যে অতীতের অচরিতার্থ

প্রেমের চেয়ে আজকের না-মেটা-খিদে অনেক বেশি বাস্তব হয়ে জেগে থাকে। সেদিনের ব্রজদুলালী হয়ে (মনে-মনে) অতীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বরঞ্চ সম্ভব, সেদিনের ব্রজদুলালী ও দীনদয়ালকে অন্য মেয়ে, অন্য ছেলে মনে করে দূর থেকে পেছনে চেয়ে দেখা।

এ কথা ওর মনে হলো, তার কারণ নবীন। নবীন ওর সঙ্গে কথা বলে, নবীনের চোখ দিয়ে ও বর্তমানকে দেখে। আরেক কারণ, এ পরিবারে ওর অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিরাজমানতা। সব সময়েই ও বনে-বাদাড়ে ঘোরে। দাস্থু সোরেনদের সঙ্গে, বাউরীদের সঙ্গে, রতন নাপিতের সঙ্গে ওর দেখাও হয়, কথাও হয় কচিৎ-কদাচ। ও জানে, ওর সঙ্গে কথা বলার খবর ওরা নবীনের বাপ-ভাইকে দেবে না। নানা কারণে ওরা ভুঁইয়াদের শত্রু মনে করে, নবীনকে বন্ধু। ও নিজেও মনে করে, নবীন যা চায়, এরাও তাই চায়। পাকারাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাঁধা-হাট—আর তাই ভাল। তাতে এদের ভাল হবে। এদের ভালর সঙ্গে ওর নিজের ভাল হওয়া-হয়ির কোন সম্পর্ক ও খুঁজে পায় না। বস্তুত, ও নিজেকে মৃত বলেই মনে করে। এই বয়সে, নিরন্তর অন্নচিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে, আজকের ছাতুটা, কালকের গুঁড়োন মুড়িটুকুর বেশি ভাল-কিছু মনে আসে না। দাস্থু সোরেন ওকে প্রায়ই বেলটা-কুলটা দেয় আর বলে, 'তুই রাজার মেয়ে হয়েছিস বলেই তো যত বিপদ তোর। ভাত জোটে না, ভিক্ষেও করতে পারিস না, খুব বিপদ।' রাজবাড়ির মেয়ে হয়ে তার সমূহ সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা দাস্থু সোরেন প্রায় বলে।

তখন দাস্থুর বাবা কান্থু সোরেন ভুঁইয়াদের জমি ভাগে চাষ করত। ঠাকুরদেরও। ব্রজদুলালীর কথা মনে করতে গিয়ে ও তার বিয়ের কথা কিছুতে মনে আনতে পারল না। বৃথা চেষ্টা। চার বছরে পাট্‌কের ভুঁইয়া-বাড়ির বিয়ে, ছ' বছরে বিধবা। যতদূর স্মৃতি যায়, ততদূরই ব্রজদুলালীর পরনে থান। গালার চুড়ি, পেড়ে কাপড়, রুপোর মাছ-কাঁটা, পায়ে মল ব্রজদুলালী কোনোদিন পরে নি।

ভুঁইয়াদের চালচলতি ছিল পুজোরী ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের মতো। তাতে তারা গ্রামে সম্মানও পেত।

দীনুকে দুলালী কোনদিন "দাদা" বলে নি। বলার কথাও নয়। দশ বছর বয়স থেকে দুলালী দীনুর মা'র কাছে যেত। বিধবা মেয়ে, রূপসী মেয়ে, মেয়ের মা দুলালীকে বছর-বছর নানা ব্রত করাত। সব ব্রতর শেষে,—

আমার এয়োৎ যেন অখণ্ড হয়
স্বামী-পুত্রের সংসার জ্বল-জ্বলন্ত হয়
আমি যেন মাথায় সিঁদুর নিয়ে মরি—

এর বদলে দুলালী বলত,

বাপের সংসার বাড়-বাড়ন্ত
ভায়ের সংসার জ্বল-জ্বলন্ত
আমার মাথায় যত চুল
তাদের তত বছর অখণ্ড পরমাই হোক।

দু-জনে চিরকালই দেখা হতো। প্রত্যেকদিন। দুলালী রাজবাড়ির মেয়ে। রাজা এখন ধানী-পানী গেরস্ত হলে কি হয়, গ্রামের মানুষ সম্মান দিত। গ্রামের মেয়ে, স্বচ্ছন্দে দুলালী সর্বত্র ঘুরত। দীনুর কাছে ব্রত-পুঁথি শুনে মুখস্থ করে নিত। দীনুর মা কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে, দীনুর বোন দুটো কচি-গ্যাদা ছিল বলে, ঠাকুর-জ্যাঠা, দীনু, দীনুর ভাই সকলের জামা-ধুতি রিপু করতে, দীনুর বইয়ে মলাট দিতে, দুলালী। তখনও বড়িগুলে কালি করতে জানত না কেউ। ঠাকুর-জ্যাঠা, বলতেন, 'দুলালীর মতো হীরেকষের কালি করতে কেউ জানে না।' জ্যাঠা-জ্যেঠি দু-জনেই বলতেন, 'হাতে-পায়ে লক্ষ্মী। রূপে-গুণে এমন মেয়ে কেন বা ও ঘরে জন্মাল, কেন বা কপাল পুড়ল. কে জানে?'

জ্যাঠা বলতেন, দুলালী ভাসা-ভাসা শুনত। জ্যাঠা না কি বলতেন, যে-সময়ে দুলালীর বিয়ে হয়, তার থেকে দু' মাস বাদে বিয়ে হলে,

ঢুলালী বিধবা হত না। ঢুলালী, কি লজ্জার কথা। বারো বছরে ওর সই কুসুমের বিয়ের দিনে বিয়ে বাড়ি যায়। কুসুমের পিসি ওকে 'দূর দূর' বলে বের করে দেন। কুসুমের মা ভুঁইয়াদের ভয়ে আটকাঠ হয়ে বলেন, 'ঢুলি। বিয়ে তোমাকে দেখতে নেই মা, এয়ো কাজে আসতে নেই। কুসি দোলায় চেপে যাবে যখন, তখন দেখ।'

ঢুলালী সেদিন বাড়ি এসে মাকে রেগে-কেঁদে বলেছিল, 'কেনই বা তখন বিয়ে দিলে? পরে দিলেই বিধবা হতাম না! কুসির বিয়ে দেখতে পেলাম না।'

তার চার বছর বাদে,সে আরেক বিয়ের দিন, কুসুমের পরের বোন মালতীর বিয়ে। বাড়ির সবাই গিয়েছিল, ঢুলালী একা দাঁড়িয়েছিল বাড়ির পেছনে, চাঁপাগাছের ডাল ধরে বুড়োআঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বিয়ের বাদ্যি-বাজনা শুনছিল। দীনু এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা ও বোঝে নি আগে। দীনুর কথা শুনে চমকে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল প্রথমে।

'কি শুনছিস?'

'বাব্বাঃ, তুমি?'

'কি শুনছিস?'

'বিয়ের বাজনা। তুমি গিয়েছিলে?'

'নাঃ।'

'কেন? বর দেখতে ইচ্ছে হয় না? বর বসিয়েছে কাকাদের বাড়ি, তাই না?'

'জানি না।'

'কি দরকার পড়ল?'

'তোকে দেখছিলাম।'

'আমাকে। হঠাৎ?'

'হঠাৎ কেন? তোকে আমি নিত্যি দেখি।'

'সে তো দেখই, কিন্তু...'

তারপর যা হয়, তা খুবই অপ্রত্যাশিত। দীনু ওর মুখের ওপর আঙুল রেখে আঙুল টেনে বলেছিল, 'তোকে সরস্বতীর মতো দেখতে।'

'ও আবার কি ?'

'বাঃ, তোকে ভালবাসি, তা একটু ছুঁয়ে দেখতে সাধ যায় না ?'

দুলালী খুব ভয় পায়। মুখ গরম হয়ে ওঠে ওর, শরীর শিউরে ওঠে। তারপর বলে, 'পাট্‌কেতে ইশকুলে পড়ছ, এইসব শিখছ ?'

'এ কথা কি ইশকুলে শেখায় ?'

'তুমি যাও, তুমি যাও তো।'

দুলালী ছুটে চলে গিয়েছিল নিজেই। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে, অনেকক্ষণ ধরে কেঁপে-কেঁপে তারপর শান্ত হয়েছিল। তারপর উঠে, খুব সাবধানে আরশি ধরে মুখ দেখেছিল নিজের। ফরশা রং, মুখখানি সুন্দর, সে তো ও চিরকালই জানে। মা বলে, 'আরশি দেখিস নে মা।' দুলালী তাই আরশি দেখে না, চুলে বেণী বাঁধে না, এলোখোঁপা বাঁধে আঙুলে জড়িয়ে। একাদশীতে উপোস করে না, ছাতু-ফল-দুধ খায়। রাতে রোজ খায় খই-দুধ-কলা।

'ভালবাসি তোকে!' কথাটা কি ভয়ঙ্কর, কি অস্বস্তির। ওই 'ভালবাসা' কথাটিকে দুলালী ছোটবেলা থেকে ভয় করতে শিখেছে।

বাউরী পাড়ার চরণ বাউরীর বউ তার মামাতো দেওরের সঙ্গে ভালবাসা করে। খুব মারদাঙ্গা হয়েছিল বাউরী পাড়ায়। পঞ্চায়েত বলেছিল, গ্রামে এ নিয়ে অশান্তি থাকতে পারে না। দেবাশ্রয়ী গ্রাম। ব্রাহ্মণের বাস আছে। চরণ তার মামাতো ভাইকে বের করে দিক। ঘরে পুষেছে কেন অনাথ-নিরাশ্রয় দেখে ?

চরণের বউ তারপর ওদের বাড়ি এসেছিল ধান নিতে। খুব দিশাহারা, মুখে চোখে সর্বনাশ লেখা ছিল ওর। ওকে বাড়ির সবাই খুব কৌতূহলে দেখছিল, দুলালীও। চরণের বউ সকলের দিকে দুই

তীব্র চোখে তাকায়। তার পর ধান নিয়ে চলে যায়। ঘরে গিয়ে ও ধান সেদ্ধ করে, উঠোন নিকোয়, তারপর স্নান করতে চলে যায় নদীর সোঁতায়। শ্রাবণ মাস, সোঁতায় জল ছিল। আর সে ঘরে ফেরে নি। কলকে ফুলের বীজ খেয়ে ও আর ওর দেওর একসঙ্গে মরেছিল। গভীর বনে। গ্রাম-জীবনে এ নিয়ে খুবই কথা হয়। দুলালীর মনে ভয় ঢুকে যায়। ভালবাসা কি রকম হয়? ভালবাসা মানে সমাজে অশান্তি, মৃত্যু?

"ভালবাসা" শব্দে ভয়। দুলালীর নিজের জ্যাঠতুত ভাই, বউকে ভালবাসত বলে জ্যেঠি বউয়ের ওপর অকথা অত্যাচার করত। দুলালীর বাবা বলত, 'অত ভাব-ভালবাসার কি আছে? সংসারে কাজ করতে এসেছ, কাজ করে যাও। বিয়ে করা, ছেলের জন্ম দেওয়া সংসারেরই কাজ। ভালবাসাতে কারও ভাল হয় না।' সেই বউটি পরে পাগল হয়ে যায়। তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে জ্যেঠি দাদাকে আবার বিয়ে দিয়েছিল।

দীনু তাকে ভালবাসে? কি করে? চিরকাল যাকে দেখেছে, তাকে কি কেউ ভালবাসে? ভালবাসে বিয়ে হবার পর দ্বিরাগমনে গেলে। নতুন দেখাশোনা হলে। দুলালী ঠিক করে, ও দীনুর কথার মানে বোঝে নি। ভালবাসে চিরকাল দেখছে, বোনের মতো ভালবাসে। বিধবা ও, বিয়ে দেখতে পারছে না বলে ওর দুঃখে দুঃখী হয়ে কাছে এসেছিল।

তখন শ্রাবণ মাস। প্রতিদিন থানে দুলালী দুধ দিয়ে আসে। সেদিনও দুধ নামিয়ে প্রণাম করে ও তাড়াতাড়ি ফিরছিল। পথেই বৃষ্টি নামে, ভিজে ঝুপসি হয়ে গেল। ছুটে ও গাছের নিচে দাঁড়াল। তারপর দেখল দীনুকে। ছাতা মাথায় ঘরে আসছে।

'অ দীনু! একটু দাঁড়াও।'

'দুলালী? তুই?'

'থানে এসেছিলাম।'

'আয়, ছাতার নিচে আয়।'

'একটু দাঁড়াও, বড্ড জল।'

'দাঁড়াই তবে।'

'ছাতার নিচে দু'জনে। আকাশ মেঘে কাল। কে বলবে বিকেল, যেন রাত নেমেছে। দুলালীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

দীনু হঠাৎ বলল, 'দুলালী!'

'কি?'

'তুই আমার কি করলি দুলালী! তোকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।'

'বল না, চুপ কর।'

'কেন তুই মহানন্দ ভুঁয়ার মেয়ে হলি? কেন বিধবা হলি?

ভয়ে দিশেহারা দুলালী বলেছিল 'তুমি না পুরুত জ্যাঠার ছেলে? তুমি না বামুন? এমন কথা আমাকে কইতে আছে তোমার?'

সেদিন দুলালী ছুটে চলে যায়। কিন্তু এখন আর সে নিজের মনকেও বোঝাতে পারে না। মাকে রেগে-ঝেঁজে বলে 'থানে যাব জান। এক হাতে দুধ, এক হাতে কলা। ছাতা নিয়ে সঙ্গে কারুকে দিতে পার নি?'

খুবই বিপদে পড়ে ও। ঠাকুরবাড়ি দিনে দু-চারবার ও এমিনই যায়। ফল নিয়ে, দুধ নিয়ে, জ্যেঠিমার হাতের তরকারি নিতে। এখন ও কি করে বলে, যাব না? বললেই লোকে সন্দেহ করবে। কি কথায় কি কথা বেরুবে। সাত-পাঁচ ভাবতে বসে ভিজে চুল মোছা হয় না। সকালে দেখা যায় ওর জ্বর হয়েছে।

খুব জ্বর হয়েছিল। যাকে বলে নিমুনিয়া জ্বর। পাট্‌কে থেকেই দীনুই না কি ডাক্তার আনে। মা বুকে পুলটিস দিত আর বসে কাঁদত। বাবা বলত, 'সেরে ওঠ মা আমার, তুমি আমার ঘরের আলো। তোমার মুখ দেখে আমি সব ভুলে থাকি মা দুলালী।'

সেরে উঠলেও শরীরে বল পায় নি অনেকদিন। তারপর ভাদ্রে

সংক্রান্তিতে ছোট ভাই সদানন্দকে কোলে নিয়ে থানকুনি তুলতে গিয়েছিল পুকুরে। দীনু এসে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা সে বলে নি, দুলালীও নয়। বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল দুলালীর। কোনমতে থানকুনি তুলে সে চলে আসে।

সন্ধ্যেবেলা দীনু এসে হাজির। উঠোনে বেতের চৌকি পেতে বসে বলল, 'খুড়ি, তোমার মেয়ের ব্যভার দেখ। এই যে অসুখ গেল, পাট্কে থেকে ডাক্তার আনলাম, অসুখ সারল, তা একবার বলতে গেল না? মা এই জল পাঠিয়ে দিল। নারাণকে ওর নামে জল-তুলসী দিল তো?'

দুলালী মায়ের হাঁক-ডাকে সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের কথায় প্রণামও করল। দীনু বলল, 'এবার চলুন। মা আপনার জন্যে প্রসাদ নিয়ে বসে আছে।'

'যা দুলালী। ছি ছি ঠাকুরদিদি বসে আছে? যা শাগ্গির!'

দুলালীকে যেতে হয়েছিল। দীনু বলেছিল, 'কেমন? কেমন সারিয়ে তুললাম?'

'তুমি সারালে?'

'আমি রোজ ঠাকুরকে ডাকি নি?'

'দীনু!'

'কি?'

'অমন করে বোল না।'

'কেন?'

'আমার কষ্ট হয়।'

'আমার যে কষ্ট হয়।'

'আমি এ কথা শুনে কি করব? তুমি শান্ত হও। আমি জাতে ছোট, তায় বিধবা। তুমি লেখাপড়া শিখছ, বাড়ির বড় ছেলে, তোমার বিয়ে হবে।'

'দেখা যাবে।'

'জ্যাঠামশায়ের বল-ভরসা তুমি।'

'দেখা যাবে।'

'বল, শান্ত হবে?'

'শান্ত হলে তুই খুশি হবি?'

'শান্তি পাব।'

'শান্তি পাবি দুলালী? শান্তি পাবি? বেশ! তাহলে আমি খু—ব শান্ত হব। আর তোকে জ্বালাব না। দুলালী একবার দাঁড়া, একবার তোকে দেখি। দুলি, দুলাই, দুলালী, তোকে কত ভালবাসি, কোনোদিন বলতে পেলাম না!'

ছুটে, প্রায় ছুটে দীনু চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে, গ্রাম থেকে। বাবাকে বলেছিল, 'আমি আপনার মতো পুরুত হব না। লেখাপড়া করব। গ্রাম থেকে যেতে-আসতে আমার কষ্ট হয়। পাটকেতে থাকব। দিদির শ্বশুরবাড়ি।'

অনেক, অনেকদিন গ্রামে আসে নি দীনু। দুলালীকে শান্তি দিয়ে, অপার দুঃখ দিয়ে সে চলে যায়। আট মাস বাদে গ্রামে ফেরে। মনসা মেলার দিনে। সেদিনে ছাতিম গ্রামে শত-শত লোক, ভোর থেকে গ্রাম মানুষে মোষের গাড়িতে ঝমঝমে বৃষ্টিতে দইথই। দুলালী মেলায় গিয়েছিল। দীনু ওকে ডেকে নিয়ে যায় কর্ণাবতীর সোঁতায়। বলে, 'এ আমার কি হলো দুলালী? তোকে ভুলতে পারি না, কিছুতে নয়, কি হলো?'

'আমিও তো ভুলি নি।'

বলেছিল দুলালী। ১৯১৭ সালে সতেরো বছরের দীনু আর দুলালী দু-জনেই বয়স্ক। বয়স্ক জীবনের সব অনুভূতির দায়-দায়িত্ব তারা জানে। এ কথা বলার পরিণাম কি হবে, তা জেনেই দুলালী বলেছিল, 'আমিও তো ভুলি নি।'

সময়টি বড় অমোঘ ছিল। সব সত্যি কথা বলার সময়। সন্ধ্যা হয় হয়, আকাশ কালো, পেছনে মনসাথান ঘিরে উত্তাল বাজনা।

রাতে "মনসামঙ্গল" গীত হবে। সামনে মরানদীর সোঁতার ঢলে মাটির জল নেমে গর্জনে ছুটছে। বাতাসে কদমের গন্ধ। বিশ্বচরাচর মেঘমন্থর, কিসের প্রতীক্ষায় বাতাস ছিল বিদ্যুৎ-চমকিত।

'ভুলিস নি? তবে কাছে আয়।'

দুলালী দীনুর কাছে এসেছিল। তারপর মুখ তুলে বলেছিল, 'আগে আমার কথা শোন দীনু।'

খুব গম্ভীর হয়ে, ধীরে-ধীরে দুলালী বলেছিল, 'আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি লাভ?'

'ক্ষতি কি?'

'কি হবে দীনু? লোকসমাজে তুমি এ কথা কইতে পারবে না, আমিও না।'

'না।'

'শুধু দুঃখ পাবে।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কি লাভ বল?'

'জানি না।'

'দীনু।'

'বল্?'

'দু'জনে মরতে পারি।'

'ছিঃ।'

'তাহলে বল, আমাকে তুমি ভুলে যাবে?'

'ভুলতে যে পারি না।'

'আমি বা কি বলব বল?'

'কিছু বলার নেই রে।'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর দীনু বলেছিল, 'দেখাই যাক। ছাতিমটা বিশ্বভুবন নয়। তুই চলে যা। একসঙ্গে যাব না। দেখলে লোকে মন্দ বলবে।'

আবার দীনু পাট্‌কে চলে যায়। পরের বছর সে ম্যাট্রিক দেয়। রেজাল্‌ট বেরুবার আগেই চলে যায় খড়্গপুর। দীনুর বাবাও জানতেন, ও খড়্গপুরে আছে। কিন্তু পাট্‌কে স্কুলের বাংলা মাস্টারের সঙ্গে ও কলকাতা গিয়েছিল। এই মাস্টার দীনুকে খুবই প্রভাবিত করে থাকবেন। কেন না পরীক্ষার রেজাল্‌ট বেরুতে গ্রামে যে ফিরে আসে সে এক অন্য দীনু। কথা কম বলে, রুক্ষ ও গম্ভীর। এই সময়ে সে মাঝিপাড়ায়, বাউরীপাড়ায় ঘুরতে থাকে কলেরার মৌসুমে। গ্রামসেবার কাজ করে। কলেরা নিবারিত হলে খড়্গপুর থেকে হেল্‌থ ইন্‌স্‌পেকটার এসে দীনুকে প্রশংসা করেন ও ফেরার সময়ে আঞ্চলিক থানায় বলে যান, 'গ্রামসেবা দিয়ে শুরু, টেররিজ্‌মে শেষ, এ কত দেখলাম।' দারোগা কথাটিকে গুরুত্ব দেন না এবং বলেন, 'বিষঝাড়ে বিষগাছ হয়, বামুন-পুরুত, দেবভক্ত, তাঁর ছেলে কি মন্দ হতে পারে ?'

দীনু দুলালীর সঙ্গে দেখা করার কোন চেষ্টাই করে না। যেন নিজেকে নিরন্তর খরচ না করলে শান্তি পাবে না, তাই এবার সে লাগে ম্যালেরিয়া বিতাড়নে। দুলালীও খুব গুটিয়ে নেয় নিজেকে। এই ভাল, এই খুব ভাল। ব্রত শিখতে যায় না আর। সংসারের কাজে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে। কিন্তু পৌষকালীর পুজোতে যখন সবাই মণ্ডপে, তখন দীনু ওকে ডেকে নিয়ে যায় ওদের বাড়ির বাগানে। বলে, 'দুলালী আমি জেনে এসেছি সব।'

'কি ?'

'আমি তোকে বিয়ে করব।'

'আমাকে ? বিয়ে ?'

'তোকে বিয়ে করব।'

'তোমার পাপের ভয় নেই ?'

'কিসের পাপ ? বিধবার বিয়ে হয়, আইন আছে। কিসের ভয় ? কলকাতা চলে যাব। শত লক্ষ মানুষ, বিরাট শহর, কে আমাদের

খুঁজে পাবে? তোকে বলছি দুলালী, আমাকে বিয়ে কর, আমাকে ধরে রাখ, নইলে আমি ভেসে যাব।'

'তবে আমিই মরব দীনু।'

'মরব-মরব—"বাঁচব" বলতে পারিস না?'

'কেমন করে বলব? তোমার সঙ্গে চলে গেলে কেলেঙ্কারী, কলঙ্ক দীনু, বাবা পতিত হবে।'

'প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠবে।'

'আমি ভুলতে পারব না, দগ্ধে মরব।'

'তুই পারবি না?'

'না।'

'তুই আমায় ভালবাসিস?'

'বাসি।'

'তবুও...'

'আমার সে সাহস নেই।'

'তোকে কি বলব বল্?'

'কিছু যে বলার নেই। জাতে অমিল, আমি বিধবা, গ্রামে সবাই...মান্যি বংশ...কলঙ্ক...'

'তবে যা।'

'যাব?'

'যা। আর কখনো আমার সামনে আসিস না, কখনো না।'

দুলালীর সেদিন মরতে ইচ্ছে হয়েছিল। দুলালী জানে নি, দীনুকে কোন্ প্রবল আকর্ষণ টানছিল, দীনু নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না।

পাট্কের স্কুলে মাস্টার হয়ে চলে যায় দীনু। বলেছিল, 'গ্রামে বসে ভুঁইয়াদের পুরুতগিরি করব না বাবা। তাতে আপনি যা মনে করেন, করবেন।'

ঠাকুর-জ্যাঠা খুবই আঘাত পান। কুলকর্ম 'করব না' বলা কি ঠিক?

'বিবাহটা করে যাও।'

'বিয়েও করব না।'

১৯১৯ সালে, উনিশ বছরের কোনো গ্রামীণ ছেলে এমন কথা বাপের মুখের ওপর বলত না। মা বলেছিলেন, 'বাপকে মনে কষ্ট দিলি ?'

'ওঁর তো আরেক ছেলে আছে।'

'তুই এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ?'

'বলব না।'

দীনু চলে গিয়েছিল। কিন্তু নিয়তি ওদের স্থির থাকতে দেয় নি। ওদের স্ব-সৃষ্ট নিয়তি। পাট্‌কেতে দীনু অসুখে পড়ে, ঘোর বিকার। ওকে গ্রামে আনা যায় নি। মা চলে যান সেবা করতে। কয়েকদিন বাদে মোষের গাড়ি চড়ে ফিরে আসেন। রোদন-স্ফীত চোখে দুলালীর মাকে বলেন, 'কাদু। যে কথা বলছি, তা ছেলের জন্যে বলছি। দীনু আমার থাকবে না। ও শুধু দুলিকে ডাকছে গো। এ আমার-তোমার লজ্জার কথা ভেব না বোন, বিকারে ডাকছে। তোমাকে, ভুঁইয়া দেওরকে ডাকছে, নাকি কি কথা বলবে!'

দুলালীর বাবা বলেন, 'চলুন বৌঠান।' দুলালীর মাকে বলেন, 'তুমিও চল। না গেলে পরে দীনু যদি না-থাকে, বামুনের মন্যি লাগবে। না গেলে পরে, যদি থাকে, তাহলে কথা হবে, ডাকতে গেল না কেন ?'

দীনু মারা যেতে পারে, এ সম্ভাবনাতেই তাঁরা কাতর হন বেশি। দুলালীর মা সোদ মানুষ। বলেন, 'দুলিকে ডাকবে না ? এক ধাই দু'জনের আতুড়ে, আজকের সম্বন্ধ ?'

বাবা-মা ও জ্যোঠিমার সঙ্গে দুলালী ঘরে ঢোকে। দীনু রক্তচোখে চায় ও বলে, 'বসে থাক্। আমি মরলে তবে উঠবি।' কুটুম্ব-স্বজনে ভরা ঘর। তাদের চোখের কৌতূহল দুলালীকে নগ্ন করে ফেলে। লজ্জায়-ভয়ে-বেদনায় বিব্রত দুলালী স্থাণুর মতো বসে থাকে।

দু'দিন বাদে দীনুর জ্বর ছাড়ে। দুলালীরা ফেরে। দীনুদের ফিরতে আরো একমাস কাটে। তারপর একদিন দীনুর বাবা দুলালীর বাবাকে ডেকে নিয়ে যান। বলেন, সোমত্ত মেয়ে, তায় বিধবা, অনেক সতর্ক থাকতে হয় মহানন্দ।'

'কেন ?'

দীনুর বাবার চোখ দুটি অপ্রকৃতিস্থ। কোন কারণে তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু টলে গেছে। তিনি বলেন, 'দীনু বলেছে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র আর আইনে চলে। ও দুলালীকে বিয়ে করবে।'

দু'জনে এই কথার প্রচণ্ড আঘাতে পাথর হয়ে থাকেন।

তারপর দুলালীর বাবা বলেন, 'আপনি আপনার ছেলের বিয়ে দেন গা। আমি আমার মেয়েকে শাসন করব। কিন্তু এ কি বললেন আপনি, ঠাকুরদাদা ? এ কি বিশ্বাস যাবার কথা ? অসুখে দীনুর মাথা খারাপ হলো ?'

'মেয়েকে কিছু বোল না। ও বা কি জানবে। হয়তো দীনুরই সব দোষ। মেয়েকে বললে কথা ছড়াবে।'

'ছেলেকে কি করবেন ?'

কথাটির মধ্যে আর্ত পিতৃহৃদয়ের দুঃখ ছিল, চ্যালেঞ্জও ছিল। আমার মেয়ে দোষী নয়, দোষী হতে পারে না। মা আমার জ্ঞান হতে রঙিন সুতো পরল না, কোনদিন উঁচু গলায় কথা বলল না।'

'দীনুরই দোষ। কিন্তু মহানন্দ। বেটাছেলের দোষ ধুয়ে চলে যায়, মেয়েছেলের দোষ যায় না।'

'ছেলের বিয়ে দেন গা।'

প্রশ্নে-সংশয়ে পীড়িত হতে-হতে মহানন্দ বাড়ি ফেরেন। স্ত্রীকে সব কথাই বলেন। দু-জনে স্থাণু হয়ে বসে থাকেন। তারপর দুলালীকে ডেকে বাবা বলেন, 'বাড়ি থেকে বাগানে যাবি না দুলালী, সাবধান করে দিলাম।'

'যাই না তো বাবা !'

'তাহলে ঠাকুর-দাদা ওসব কথা বলে গেল কেন? কেন বলল দীনু···তোকে···?'

'জানি না তো বাবা।'

দুলালী অন্তরে-অন্তরে কোথায় সাহস পাচ্ছিল। কোথায় জানছিল, সে দোষ করেনি। দীনুকে ভালবাসা দোষ নয়। বাবা-মাকে বোঝানও সম্ভব নয়।

'কোন দোষ করিস নি তো মা?'

'না বাবা। কোন দোষ করি নি।'

'জানতাম আমি, জানতাম।'

'তাহলে থানে যাব না?'

মহানন্দ কন্যাস্নেহে সাহস পেয়ে আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দেন। বলেন, 'যাবি। যেমন যেতিস, তেমনি যাবি। আমার মন বলছে তুই কোন দোষ করবি না।'

'ঠাকুর-জ্যাঠাকে বল, ছেলেকে নিয়ে যেতে গ্রাম থেকে, বল বিয়ে দিতে। আমি তার কারণে কোন কথা শুনতে পারব না। তোমাকে কেউ কিছু বললে আমি আত্মঘাতী হব।'

ভালবেসে দোষ করেনি সে, ভালবাসা অচরিতার্থ থাকবে, তা সে মেনে নিয়েছে, তার পরেও অসম্ভব নির্লজ্জ সব কথা বলে গ্রামে তার অস্তিত্ব বিপন্ন করার জন্যে দীনুর ওপর তার রাগ হয় অসম্ভব। সঙ্গে-সঙ্গে বুকে অসহ যন্ত্রণা। আনন্দে। দীনু প্রকাশ্যে বলেছে তাকে বিয়ে করবে।

দীনু থান থেকে ফেরার পথেই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'সরে যাও দীনু।'

'তুই কি বলেছিস খুড়োকে?'

'তোমার বিয়ের কথা বলেছি।'

'তোকে ভালবেসে কাকে বিয়ে করব।'

'দীনু! তুমি বিয়ে না করলে আমি আত্মঘাতী হব। তোমার সঙ্গে

আমার বিয়ে হবার নয় দীনু। আমি যতকাল বাঁচব, আজ বাপের ভাতে, কাল ভায়ের ভাতে থাকতে হবে, এই গ্রামে। তুমি আমার আশ্রয় কেড়ে নিতে চাও?'

'ভালবাসি একবার বল্।'

'ভালবাসি। তা তুমিও জান।'

'আবার বল্।'

মাথা উঁচু করে রানীর মতো স্বচ্ছন্দে দুলালী বলেছিল, 'ভালবাসি, যতকাল বাঁচব ভালবাসব। কিন্তু এ জীবনে এ ভালবাসার আর কিছু হবে না আমাদের, তুমি বিয়ে কর। তোমাকে ভালবেসে দীনু... তোমার জন্যে আমি বুক পেতে দিতে পারি...তুমি হেঁটে গেলে আমার অঙ্গে লাগে না...তোমাকে ভালবেসে দীনু, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে বলতে পারি, আমাকে ভালবেসে তুমি সে বিয়ে করতে পার না?'

'পারি কি না দেখি দুলালী। দেখি!'

'আমি যাই।'

'যা পথ দেখে যা। আঁধার হয়েছে।'

ঘরে চলে আসে দুলালী। তারপর একদিন শোনা গেল, দীনুর বিয়ে হবে। ওই পাট্কে গ্রামে। তারই দিদির ননদের সঙ্গে। দিদির শ্বশুর মারা গেছেন সদ্য। এক বছর মহাশৌচ। এক বছর বাদে বিয়ে হবে। শোনা গেল দীনু কলকাতা যাচ্ছে। সেখানে কি ছাপাখানার কাজ শিখবে। ভগ্নীপতি ঠিক করে দিয়েছেন।

সেদিন দুলালী থাকতে পারে নি। নদীর সোঁতার পাশে, টিলায় উঠে দাঁড়িয়েছিল গাছের গায়ে লেপটে। গরুর গাড়ি যাচ্ছিল, দীনুর চোখ গ্রামের দিকে। দীনু ওকে দেখতে পায় নি। ও দু-চোখ ভরে দেখে নিয়েছিল। অসুখের পর শীর্ণ মুখ, ফরশা রঙ, চুল ছোট ছোট, মুখে একটা আশ্চর্য হাসির রেখা। সে হাসি দেখলে বুক ফেটে যায়।

বিয়ের দিন সহজে মেলে নি। শেষে ১৯২৪-এর নভেম্বরে বিয়ে

ঠিক হলো। বাজনা বাজল। নতুন চালা উঠল বিয়ের তৈজস রাখতে। জানা গেল যাত্রার সময় সকালে। বারোটার মধ্যে বর যাত্রা করে বেরুবে। গাছের নিচে চাঁদোয়া খাটিয়ে বসবে। বিকেল তিনটেয় বর গ্রাম থেকে যাত্রা করবে।

লোকজন শীতের বেলায় চট করে সময় যায়। মহানন্দ বিয়ের যত মাছ, সব দেবেন, দই, মিষ্টি, বউকে যৌতুকী মোহর।

গাছের নিচে দীনু বসেছিল আলো করে। যায় নি দুলালী, সারাদিন যায় নি। ঘর থেকে বেরোয় নি। কারুকে বলতে পারে না. অথচ বুক ফেটে যাচ্ছে। শেষে রুক্ষ চুল হাতে জড়িয়ে, গায়ে থানের আঁচল টেনে দুলালী পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের আঙিনার প্রান্তে। দূর হলেও ওই তো দেখা যাচ্ছে। চেলীর ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, গায়ে শাল, কপালে পুজোর তিলক, কানে কুণ্ডল, বংশের নিয়ম। দীনু সেখান থেকেই চোখ তোলে, ওকে দেখে। দেখে, চেয়ে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। তারপর গলার মালা ছিঁড়ে ফেলে, ফেলে দেয় শাল, কপালের তিলক মুছে ফেলে।

কন্যাপক্ষ থেকে যারা বর নিতে এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে দীনু ভীষণ, ভীষণ চেঁচিয়ে বলে, 'ফিরে যান আপনারা। আমি বিয়ে করব না।' এই ভীষণ ও প্রচণ্ড বিস্ফোরিত শব্দ-কয়টি গ্রামের আকাশ চিরে ফেলেছিল, প্রলয় সূচিত করেছিল।

বাঁশের মাচানে শুয়ে ও আজ চুয়ান্ন বছর পরেও মনে করতে পারছে সব। ছবিগুলি সাজান ছিল মনে। ওর কৈশোরে পটুয়ারা আসত পট দেখাতে, আস্তে-আস্তে গোটান পট খুলত, ছবি দেখাত, গান গেয়ে পটের বিষয়টির কাহিনী বলে যেত। পটুয়ারা কে, কোথায় গেছে সব, ওর কৈশোর-যৌবনের মতোই হারিয়ে গেছে কোথায়।

আজ ওর মনে বসে কোন পটুয়া ছবির-পর-ছবি দেখাচ্ছে, বলে দিচ্ছে সব? বুকে কি ব্যথা। স্মৃতির কি ভার আছে, তাতে ব্যথা কেন?

গ্রামে প্রলয় নেমে এসেছিল। এখনও ছবিগুলি কেঁপে উঠছে, নড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে।

ঠাকুর-জ্যাঠা বলেছিলেন, 'তুই আমার ছেলে নোস্। দূর হয়ে যা এখনি।'

'যাব, তাই যাব।'

লাফ দিয়ে এ বাড়ি এসেছিল দীনু। চীৎকার করে বলেছিল, 'চল্ দুলালী। এরপর গ্রামে থাকলে ওরা তোকে জীয়ন্তে ছেঁচবে।'

দুলালী অজ্ঞান হয়ে যায়।

দীনু গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। রাগে-অপমানে-লজ্জায় ঠাকুর-জ্যাঠা ওকে খড়ম ছুঁড়ে মারেন। কপাল ফেটে যায়। পরে কাটার দাগটি ওকে সনাক্তীকরণে বদন খাঁকে সাহায্য করেছিল।

গ্রাম থমথম করতে থাকে। সকলেই ভুঁইয়াদের প্রজা। তারা কিছু বলে না। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়। ঠাকুর-জ্যাঠা অভিশাপ দেন মহানন্দকে। দু-পরিবার পরস্পরকে দোষ দেন। দুলালী ঘরের কোণে পড়ে থাকে। দীনুর খোঁজ চলতে থাকে।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর সকাল। ঠাকুর-বাড়ি থেকে জ্যেঠিমার আর্তকান্না, 'দীনু রেলে ডাকাতি করেছে, ধরা পড়েছে, দীনুব ফাঁসি হবে? ওরে দীনু রে-এ-এ-এ-এ।'

তারপর ফাঁসির খবর। ঠাকুর-জ্যাঠা উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ঘট ফিরে দিলাম, ঠাকুর ফিরে দিলাম। আমার ছেলেকে তুমি খাওয়ালে ওই মেয়েকে দিয়ে। তোমার ঠাকুর পুজো করব না, তোমার জমিতে থাকব না। অভিশাপ দিচ্ছি, নির্বংশ হও, নির্বংশ হও, নির্বংশ হও।'

তারপর গ্রামে পুলিশ। পাটুকে থেকে হাতি এসেছিল, পুলিশের-পর-পুলিশ। ঘর থেকে ওরা ঠাকুর-জ্যাঠাকে, জ্যেঠিকে, ছেলে-মেয়েদের লাথি মেরে বের করে। হাতিকে ডাঙশ মারে মাহুত, হাতি ঘর ভাঙতে থাকে। ঠাকুর-জ্যাঠা বাবাকে বলেন, 'কিছু কোরো না। যাক্, সব যাক্।' তারপর পুলিশ-দারোগার সামনে মাথা পেতে দেন।

বলেন, 'ছেলে গেল, ঘর গেল, আমার ওপর দিয়ে দয়া করে হাতি চালিয়ে দিয়ে যাও, তোমার পায়ে ধরি।'

দারোগা চেঁচিয়ে ওঠে, 'করেন কি, করেন কি, আমি কায়েত যে?'

'আমি কি?'

ঠাকুর-জ্যাঠা দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে যেন বিশ্বচরাচরকে বলেন, 'আমি কি?'

'আপনি বামুন।'

'ব্রাহ্মণ আমি? তাতেই ছেলেকে ডোম ফাঁসি দিল, ডোম দাহ করল? তোমার সেপাইরা আমার পরিবারের হাত ধরে টানল? তারপরও আমি ব্রাহ্মণ আছি?' তাঁর আর্ত হাহাকারে সবার অস্বস্তি জাগে, দারোগারও, সে কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

ঠাকুর-জ্যাঠার পা ধরেছিলেন বাবা। ঠাকুর-জ্যাঠা বলেছিলেন, 'তোমার মেয়ে যে বেঁচে আছে মহানন্দ। সন্তান-শোক যে পাও নি। তাতেই তোমার কি সর্বানাশ হবে তাই ভাবছ। কেন ঠাকুর নেব তোমার? তোমার বিগ্রহ? হোক, সর্বনাশ হোক। এতে যদি সর্বনাশ হয় তোমার, তাতে আমার তিলেক হলেও শান্তি হবে। মেয়েকে দিয়ে আমার এত বড় সর্বনাশটা করালে?'

ঠাকুর-জ্যাঠারা চলে যান, চলে যাচ্ছেন, বাউরীরা, মাঝিরা ওঁদের নিয়ে যাচ্ছে, বাউরীরা, মাঝিরা ওঁদের ভালবেসেছিল। ওঁরা না কি গাছের নিচে রাত কাটাতেন, মাঝিরা পাহারা দিত ঘিরে। চার দিনে বিয়াল্লিশ মাইল গিয়ে খড়গপুরে। রেল-টাউনের কারা যেন লুকিয়ে এসে টাকা দিয়ে যায়, টিকিট কেটে দেয়। ওঁরা জগন্নাথধাম চলে যান তখন। তারপর কে কোথায় গেল? মানুষও হারিয়ে যায় কোথায়, দুলালীর অভিশপ্ত যৌবনের মতো?

ভুঁইয়াবাড়িতে মহানন্দ বলেছিলেন, 'দুলালীকে কেটে ফেলব।' তিনিও অকূল পাথারে পড়েন। তাঁর মেয়েকে ভালবেসে দীনু পরবাসী, রাজদ্রোহী, ফাঁসিকাঠে নিহত। দীনুর বাবা নির্দোষ মানুষ, তাঁর ঘর

ভুঁইসই। যে মনসা পুজা কুলকাজ, সেই পুজো ছেড়ে পুজারী চলে গেলেন। দেবরোষ, ব্রহ্মরোষ, রাজরোষ গ্রামের ওপর। সব ওই দুলালীর জন্যে। দুলালীর মা স্বামীর হাতে দা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'ওকে একা কাটলে হবে না, আমাকেও কাট। তারপর, বেটাছেলে তুমি, আবার সংসার কোর।'

'তোমার কথায় সব হবে? সমাজ নেই?'

'সমাজ বলেছে ওকে কাটতে?'

'ফেলে দিতে বলেছে।'

'দাও। আমিও যাব। মা-মেয়ে ভিক্ষে করে খাব।'

'ওর জন্যে সর্বনাশ হলো, তবু ওকে ছাড়বে না?'

'সমাজ আবার কে, ছাতিমে? তুমিই তো সমাজ। তুমি যা বল, তাই হয়। সমাজ দেখাচ্ছ?'

দুলালীকে মেরে ফেললে সহজে সমাধান হতো। কিন্তু দুলালীর মা অন্দরে বাধা দেন। বাইরে বাধা আসে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দিক থেকে। দাসু মাঝির বাবা, বুলন সোরেন বলে, 'যাবার কালে দীনু ঠাকুর আমাদের বলে গেল, দিদিকে দেখতে। ওকে তুমি মারতে পারবে না। তাহলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাব। দীনু ঠাকুরের সেথোদের সন্ধান করে বলে দিব।'

মহানন্দ গেরস্থ মানুষ। প্রচণ্ড বিপর্যয়ের নৃশংস হয়েছিলেন, বাধা পেতে আবার ধাতস্থ হন। কিন্তু তিনিই গ্রাম-সমাজের মাথা। ঘরের পাপ জব্দ করা তাঁরই কাজ। তাঁর মেয়ের কারণেই গ্রাম দেবরোষে পড়ল।

বাড়িতেই একঘরে করে রাখা হয় দুলালীকে। এই ঘর তুলে দেওয়া হয়। সংসারে প্রবেশাধিকার থাকে না। চাল-ডাল—তেল-নুন—কাঠ-কেরোসিন—কাপড়-গামছার ব্যবস্থা হয়। তারপর প্রায়শ্চিত্ত করে ঠাকুর ঘরে তোলা হয় আবার। সেই থেকে এই জীবন। মা যদ্দিন ছিলেন, আসতেন, বসতেন বাইরে। মা কাঁদতেন।

দুলালীর কাঁদার শক্তি ছিল না। রাত-দিন মনে হতো, কেন ওর কথা শুনি নি, কেন চলে যাই নি, ও তো বলেছিল, ছাতিমের বাইরেও বৃহৎ বিশ্বভুবন আছে? মনে হতো, কি জন্যে, কাদের মান-সম্মানের কথা ভেবে ওকে "না" বলেছিলাম? দীনু নেই, কোনোদিন আসবে না, সে কথা মেনে নিতে কতদিন কি তীব্র কষ্ট হতো। তারপর দিনে-দিনে সে কষ্টবোধ কমে গেল। সদানন্দ তখন আট বছরেরটি।

আজ সদানন্দ বাষট্টি বছরের বুড়ো। বাড়ির কর্তা। কোথায় কে, কোথায় ছিল ঠাকুর বাড়ি, কোথায় কে কবে দূর থেকে তাকে দেখে 'বিয়ে করব না' বলে উঠে যায়, কবেকার কথা সব। সব মিথ্যে হয়ে গেল। রয়ে গেল পেটের জ্বালা, দিন যাপনের গ্লানি।

নবীন কাজ পেলে ওর কোন দুঃখ থাকবে না।

ও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনে করতে চেষ্টা করল, সেদিনের দীনদয়াল, সেদিনের দুলালীর অনুভূতির তীব্র দহন। না, মনে নেই। শীতের আকাশে আলো মলিন, ঈষৎ মেঘের পাতলা জাল, বাতাস, বাতাসে পাকা আমনের গন্ধ, ট্যামটেমি ভেঁপুটা বাজছে, ঠাকুর বাড়িতে বাইরে একটা মস্ত পাকুড় গাছ। তার নিচে যেমন-তেমন চাঁদোয়া। উঁচু চৌকিতে বর বসে আছে। আগুনের মতো রং, টিকাল নাক, ঈষৎ লালচে চুল, কপালে তিলক জ্বলছে, কানে কুণ্ডল, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। তাকে দেখছে, দেখছে একটি মেয়ে, শিরীষ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। তার পরনে সাদা থান। শীতের জন্যে থানটি টেনে গায়ে জড়ান। রুক্ষ চুলে হাতে জড়ান খোঁপা। মেয়েটির ভুরু টানা-টানা, নাক একটু চাপা, ঠোঁট দুটি পুরন্ত, গায়ের রং অতসী ফুলের মতো, চোখ কালো, বিস্ফারিত, পলক পড়ছে না। বর চোখ তুলল কি কথা বলতে-বলতে কার সঙ্গে, কথা বন্ধ হয়ে গেল, মুখ ফাঁক হয়ে আছে, বন্ধ হলো, বর দাঁড়িয়ে উঠল। গলা থেকে মালা ছিঁড়ে ফেলল, গা থেকে শাল ছুঁড়ে ফেলল। বলল, 'ফিরে যান আপনারা। আমি বিয়ে করব না!'

হ্যাঁ, অন্য কোনো দুলালী, অন্য কোন দীনুর ছবি। ছবি মনে আছে, ছবি কথা বলছে, কিন্তু ওদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয় আর। চুয়ান্ন বছর বড় বেশি সময়। বড় বেশি দিন বাঁচা হয়েছে, বড় বেশি দিন। আটাত্তর বছর বড্ড বেশি বয়েস। এতদিন অবধি কেউ বাঁচে না। মা বলত, 'শরীরে রয় ক্ষয় হলো না, পেটে ছেলে ধরতে হলো না, আমি তো মরছি দুলি, তুই কদ্দিন বাঁচবি ভাবলে ভয় করে।'

সে সময়ের কেউ নেই গ্রামে। যাদের সঙ্গে ছোটবেলা—

'এক পা জলে
কদম তলে
দু পা জলে
রসাতলে'—

খেলেছে দুলালী, তারা কে কোথায়, মরে ভূত। যেখানে দাঁড়িয়ে দীনু দুলালীকে দেখত দুলালীদের সে বাগানে এখন ফণীমনসার গজাড় জঙ্গল। বড় বেশি দিন বেঁচেছে ও, সময় ওকে ফেলে চলে গেছে। দীনু তো তেমনি থেকে যাবে স্মৃতিতে, চব্বিশ বছরের রূপবান যুবক। দুলালী এখন আটাত্তুরে বুড়ী। চলে-ফিরে বেড়ায় সেই কারণেই। জীবনে পুরুষ সঙ্গ হলো না। শরীর তাই একেবারে পোড়ো হলো না। সদানন্দের মেয়ে কায়েতকে বিয়ে করল, মামার বাড়িতে আলাপ করে। সদানন্দের বউয়ের কোন্ ভাই নাকি ক্যাওট মেয়ে বিয়ে করে দুর্গাপুরে থাকে। সে মেয়ে নার্স। কারো জাত যায় না তাতে, কলঙ্ক হয় না। কি অপচয় কি বৃথা বাঁচা। শুধু নবীন, দীনুর মতোই ডাকাবুকো সে, ওর জীবনের সন্ধ্যেবেলা একই আত্মবিশ্বাসে বলে. পিসিকে সে নতুন জীবনে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা। ঝিঙে ফুল তোলার সময়, রূপকথা শোনার সময়। ঝিঙের ফুল সন্ধ্যেবেলা ফোটে। দুলালীর যৌবনে, উঠোনের মাচায় যখনি ঝিঙেফুল অজস্র ফুটত, মা বলত, 'চারটি ছিঁড়ে ফেল্ মা। অত ফুলে গাছের জান টেনে নেবে, ফল হবে না।'

ঝিঙেফুল তুলে ফেলে তুলালী সলতে পাকাতে বসত। বুড়ী, দাসী, আন্দিমণি তখন তুলালীর ছোট ভাইবোনদের চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়াত আর রূপকথা বলত, 'তখন চাঁদের আলো ফুটফুট করছে। রাজকন্যের মুখে চাঁদ আলো ফেললেন। ফেলেই বললেন, এই কন্যে আমার চাই।'

জীবনের সন্ধ্যেবেলায়, ঝিঙেফুল তোলার কালে, রূপকথা শোনার কালে, নবীন বলে তাকে নতুন জীবনে নিয়ে যাবে। পাকা একটা বাঁধান পথ গড়িয়ে নতুন সময়কে গ্রামে টেনে আনবে কান ধরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র করিয়ে নেবে সরকারকে দিয়ে।

হোক, ওদের ভাল হোক। কি দোষ করেছে ছাতিম গ্রাম, সে চিরকাল আঁধারে পড়ে থাকবে? আলো বলতে কেরাসিন, বাত্তি বলতে ট্যামটেমি আর পটা, পথ বলতে কাঁচা পথ, সাপ কাটলে রোজা, অসুখ হলে রতন নাপিতের ঝাড়ফুক, নয় তো পাট্‌কে থেকে ডাক্তার?

ওদের ভাল হোক।

॥ ৪ ॥

কয়েকদিন বাদে নবীন ওকে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, 'কি দেখছ বল তো?'

'দেখি আগে।'

মাঝি পাড়া, বাউরী পাড়া, গ্রামের সবাই পোড়ো ঠাকুর বাড়ির জঙ্গল কাটছে।

'ওখানে কি হবে?'

'মূর্তি বসবে না? আমিই পঞ্চায়েত থেকে আর্জি দিয়েছি। ওই ভিটেতে মূর্তি বসাও। গ্রামের লেবার দিয়ে সাফ করাব জঙ্গল।'

'পাকুড় গাছটা কাটবি?'

'না পিসি, অত বড় গাছ কাটা যায়? ভিটেয় গাছ বা কত। ওই তেঁতুল গাছগুলো বিক্রি হবে। কাঁঠাল গাছটাও। আফলা। টাকা পঞ্চায়েতের কাজে যাবে।'

'তুই বললেই ওখানে মূর্তি বসবে?'

'শুধু বললে কি আর হয়েছে পিসি? ন মণ তেল পুড়ছে, তবে না রাধা নাচল।'

কয়েক দিন ধরে গাছ কাটা চলল। টাউন থেকে ঠিকাদার এসে আফলা আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, সব গাছ কিনল। বিস্তর জ্বালানী নিল সকলে। শুকনপাতায় আগুন দিয়ে ভিটের স্যাঁতসেঁতে ভাব তাড়াল।

তারপর আগাছা উপড়ে, বাড়ির পোড়ো ভিটে জল ঢেলে পিটিয়ে, চারদিক সাফ-সুতরো করতে ক-দিন গেল। দাশু সোরেন নবীনকে বলল, 'দিলাম লেবার। সাফাই হলো। তা দেখ, বিয়াল্লিশ জন লোক সাত-দশ দিন খাটলাম।'

'লেবার উঠে যাবে, রাস্তা হলে। যা পেলে না, তার ডবল পাবে।'

'রাস্তা হবে তো?'

'হবে বলেই তো বলেছে। পি. ডব্লু. স্যাংশান এসে গেছে।'

'মূর্তি বসবে কোথায়?'

'ওখানে।'

'কিসের ওপর?'

'বেদী হবে।'

'সে তো রাজমিস্ত্রীর কাজ।'

'সে সরকার করবে।'

'সরকার?'

'দেখি, টাউনে যাই।'

সদন খাঁ হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, 'দেশের গৌরব নবীন, দেশের গৌরব। তোমরা, গরিব গাঁয়ের মানুষ হয়ে অত কাজ করলে, বেদী

আমি করে দেব। জেনে নিই, কত বড় বেদী লাগবে, রাজ আমি পাঠাব।'

'রাস্তার খবরটা জানলেন? কবে হাত দেবে?'

'এখনও জানিনি, তুমি কি শুনেছ?'

'এম. এল. এ. বলল, সব হয়ে যাবে, তাই শুনেছি।'

'তবে আর কি। ছাতিমে রাস্তা হলে পাট্‌কে-কন্নাতি-কাঁদোরেরও লাভ।'

'সেই জেনেই তো বলেছি। রাস্তা হলে আমার কি। পাট্‌কেতে আপনার লায়ের চাষ আছে, ছোট আড়ত আছে, গরুর গাড়িতে মাল টানান, লরি যাবে এখন। আমার ব্যবসা-কারবার তো নেই। রাস্তাটা হয়ে গেলে এবার গ্রামে চীনেবাদামের আর গমের চাষ করাব।'

'সে ভাল, সে ভাল। চীনেবাদাম তো ক্যাশ ক্রপ, আর গম ওখানে ভালই হবে।'

'আমাদের পোড়ো দীঘিটা গাঁয়ের লেবার দিয়ে কাটিয়ে নেব।'

'সে খুব ভাল কথা। সত্যি নবীন, মন থেকে বলছি, এই যে তুমি দশজনার কথা ভাব, দশজনার হয়ে কাজ কর, এ দেখলেও আমার ভাল লাগে। আমার এ-কি কুপ্রবৃত্তি বল দিখি? বাপ করে-কর্মে-রেখে গেছে, তাই বাড়িয়ে চলেছি।'

নবীন সেখান থেকে এম. এল. এ.-র বাড়ি যায়। এম. এল. এ. বলেন, 'নিশ্চয় রাস্তা হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বক্তৃতামঞ্চে নেতা হয়ে যান ও নবীনকে ধমকে বলেন, 'হবে না মানে? যত উন্নতি অগ্যত্তর হবে? ছাতিম, দীনু ঠাকুরের গ্রাম হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকবে? রাস্তা হতেই হবে। ওই রাস্তা দিয়ে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ, তাদের শ্রমে উৎপন্ন পণ্য নিয়ে বহিরাঞ্চলে আসবে, শ্রমলব্ধ অর্থ নিয়ে হাসিমুখে গ্রামে ফিরে যাবে।'

নবীন বোঝে, বাবুর "ক্ল্যু" এসেছে এবং স্রোতোমুখে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। তারপর, প্রয়োজনীয় বিরক্তি দিয়ে সে বলে, 'আপনার জন্যে অনেক খেটেছি ভোটের আগে। পঞ্চায়েতের আগেও কাজ করেছি। নিজের জন্য আমি কিছু চাই না।'

'প্রেসে কাজ শিখছ কেন? বাড়িতে অশান্তি?'

'না না, এমনি শিখছি। দেখুন, রাস্তা নেই বলে অসুখে-বিসুখে, দুর্ঘটনায়, বিপদে বড় কষ্ট পাই। রাস্তা হলে···ভাল রাস্তা আছে বলে না তেমুখী গ্রামে দমকল যাচ্ছে। অ্যাম্‌বুলেন্‌স্‌ যাচ্ছে টাউন থেকে।'

'তা যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামও তো টাউনের কাছে?'

'হ্যাঁ, এও জানি ছাতিম টাউন থেকে অনেক দূরে। অতটা আশা করি না যে, ছাতিমে দমকল যাবে, অ্যাম্‌বুলেন্‌স্‌ যাবে, সে হয় না। কিন্তু রাস্তা হলে···'

'জানি, জানি। রাস্তার প্রয়োজন আমাকে বোঝাতে হবে না। কিন্তু···'

'কি?'

'অন্য কোনো গ্রাম যদি ক্লেইম দিয়ে বসে?'

'এ আপনি কি বলছেন? সেই তিন বছর ধরে আমি রাস্তার জন্যে হেঁটে মরছি। অন্য গ্রাম।'

'কি জান, আমাদের এম. পি.···?'

'তিনিও জানেন।'

'একেক এম. পি. তাঁর অঞ্চলকে দেখ না, পথঘাট করে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

'দেখি, কি হয়।'

প্রেসের মুরারিবাবু নবীনের কাছে সব কথাই শুনলেন! তিনি চিরকালই নিরাশাবাদী। বললেন, 'এত কথা বলছে যখন, তখন আর রাস্তা হলো না।'

'না না, হবে। এত চেষ্টা করছি এতদিন ধরে, হবে না? বলেন কি?'

'চেষ্টা যেমন তুমি করছ, তেমনি অন্যেরাও করছে কি-না খবর নিয়েছ? তা যদি নাও করে, তাহলেও এ অঞ্চলে ধর এ বাবদে ক-হাজার টাকা ঢালার পর ফের রাস্তার জন্যে টাকা ঢালবে?'

'ক-হাজার টাকা ঢালবে কিসে?'

'নবীন, কথা যে বল, তাতে বুদ্ধির কিছু নেই। বলি মূর্তিটা আসবে কিসে? ঢাকা ট্রাকে? উজীর-নাজীর হাকিম-হুকুম আসবে কিসে? জীপে? জীপ আর ট্রাক আসবে কিসে? রাস্তা দিয়ে? রাস্তা কোথায়? এখনকার মতো একটা যা-হয় তা-হয় পথ করতেই হবে। হাইওয়ে থেকে তোমাদের গ্রামের মধ্যে তো খানিক মাঠ, খানিক খোয়াই, খানিক ধানখেত, খানিক কর্ণাবতীর মরা সোঁতা। তা, সে কাঁচা রাস্তা করতে পয়সা লাগবে না?'

'সে রাস্তার জন্যে যদি ফ্রি লেবার দিই? মালমশলা তো লাগছে না তেমন।'

'ওর মধ্যে যেও না তো। দশটা ভুষুণ্ডির কাক মরে তবে এই মুরারি পাত্তর জন্মেছে। স—ব জানা আছে আমার। ও পি. ডব্লু. ডি-র ম্যাও, পি. ডব্লু. ডি. ধরুক গে। বরঞ্চ ওই এম. এল. এ. ওই ভূষণোটাকে বল গে, রোড-লেবার যেন গ্রামের লেবার হয় বলে ব্যবস্থা করে। পাক গ্রামের লোকরা দু-পয়সা।'

'তাই বলি গে।'

এটি টাউন, বড় শহর নয়। কিন্তু টাউনের মানুষের মানসিকতায় এই সব দুশো রকম ঘোরপ্যাঁচে নবীন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে সে গ্রামে ফেরে।

গ্রামেও মতদ্বৈধ। তারই বাড়িতে।

সদানন্দ বলে, 'নবীন, "রাস্তা রাস্তা" বলে যে নাচছ, তার ফলাফল ভেবে দেখেছ?'

'ফলাফল আবার কি ?'

'রাস্তা হলে কি হবে ?'

'সে আপনিও জানেন, বাবা।'

'কি উন্নতি হবে ? বল আমায়। এই তো টাউনে যাচ্ছ আর আসছ, কি উন্নতিটা দেখছ বল ? এখনো গ্রামের চালচলতি ভদ্রস্থ আছে। মেয়েরা নাইলন পরছে না। ছোঁড়ারা কানে ট্রানজিস্টার চেপে ঘুরছে না। সর্বত্তর ওই সব বজ্জাতি, ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে।'

'ও সব কথা থাকুক বাবা।'

'তোমার এ সব কথা বিষ লাগবে বাবা, তা আমি জানি। কিন্তু তবু বলছি, বাইরে কোথায় তুমি ভাল অবস্থা দেখছ। সেই তো হা-ভাত জো-ভাত, আর হাহাকার। রাস্তা কেটে কি সুরাহা হবে। বাইরের বেনোজল ঘরে ঢুকবে। ভাল কিছু হবে ?'

'দেখাই যাক।'

'লাভের মধ্যে চাষ-কাজে, ঘর ছাইতে, মুনিষ কাজে লোক পাব না। হয় সব ব্যাটা বাইরে ভাগবে, নইলে বলবে, বাইরের মজুরী দাও।'

'পারলে দেবেন, নইলে দেবেন না। আপনার যদি আট আনা পয়সা আর ভাত-মুড়ির চেয়ে অধিক দেবার সঙ্গতি না থাকে, দেবেন না। তা বলে ওরা কোথাও দুটো পয়সা বেশি পেলে সেখানে যাবে না ? আপনার কেনা হয়ে পড়ে থাকবে ?'

'তুমি তো তা বলবেই। জমি বলে মায়া-মমতা নেই তো মোটে।'

'নেই, সত্যিই নেই। এ জমি, আর আপনার রাজত্বি থেকে কার কি ভাল হয়েছে ?'

'সেই জমির ধানের ভাতই তো খাচ্ছ।'

নবীন হঠাৎ কঠিন হাসল। বলল, 'আপনার যে হক, আমারও সেই হক। এ তো দেবোত্তর জমি।'

'বটে। জ্ঞানটি কে দিলে শুনি ?'

'যে দেবার।'

'ওই ডাইনি।'

'ওঁরও জীবদ্দশায় সমানই হক। ওই ডাইনির স্ত্রীধন বলতে তো তিরিশ ভরির গয়না ছিল, তা আপনার সংসারেই গিয়েছে।'

'নবীন! যা জান না, তা নিয়ে…'

'জেনে দরকার নেই। আপনি থাকুন আপনার হিসেব নিয়ে। আপনাদের মতো লোকের জন্যে গ্রামের এই দশা। এত কুয়োর ব্যাং হয়ে রইলে আজকের দিনে চলে? রাস্তা থাকলে বাবা, আপনার সে ছেলেটা ছ' বছরে নিমুনিয়ায় মরত না। তক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া যেত।'

'নেওয়া যেত। হাসপাতাল আর ডাক্তারী ওষুধে যদি সবাই বাঁচত, তাহলে আর টাউনের মানুষ মরত না। তুইও মরবি নবীন। বেশি ভাল হতে গিয়ে মরবি। দীনু ঠাকুর মরেছিল না?'

'কার সঙ্গে কার নাম করলেন বাবা? তাতে আর আমাতে? তুলনা হয়?'

সদানন্দ ভীষণ রেগে বলল, 'যদি চাঁদ-সূর্য থেকে থাকে, তবে অভিশাপ দিচ্ছি, ও রাস্তা হবে না, হবে না, হবে না। লীডার হয়েছেন উনি। বাইরে ভাল সাজাচ্ছেন, বাপকে অশ্রদ্ধা?'

'পিসিমাকে চাল-ডাল-তেল-নুন ঠিকমতো দেবেন। নইলে আমি অনর্থ করব। মনে থাকে যেন! চাষ-বাসের মুখ বন্ধ করে দেব। আমি "না" বললে কেমন কে আপনার জমি চোটায় দেখে নেব।'

সদানন্দ এবার ঘাবড়ে গেল এবং কথা বাড়াল না। দীনু ঠাকুরের মূর্তির ব্যাপারে দিদি কোনো কথা যেন না বলে। সে কথা নবীনকে বলার ইচ্ছে ছিল। বলল না। নবীন ভাল-তো-ভাল, মন্দ-তো-মন্দ। আরো কি, গ্রামের সকলেই সদানন্দ ও তার ছোট ছেলেকে অপছন্দ করে। নবীন ওদের আপনজন। নবীনকে চটিয়ে নিজের ক্ষতি করা ঠিক নয়।

নবীনের মা রাতে বলল, 'নবীনকে বলবেই বা কেন? এমনি একবার চুপ্‌সাড়ে যেয়ে বুড়ীকে তাইসে এস।'

'ওর ঘরে যাব?'

'ছামুতে দাঁড়ালে দোষ কি? দেখ, একালে ঠাকুরের মাহাত্ম্যি নেই। উনি হতে ঠাকুর পুজো উঠল, পুরুত দেশান্তরী হলো। বামুনের ছেলে ফাঁসি গেল তো? সে মানুষ বনেবাদাড়ে ফেরে, ঠাকুরের বাহন তো কাটে না? এত মানুষ লতায় কেটে মরে, উনি কি অজয়-অক্ষয় পরমাই নিয়ে এসেছিল? তাতে আমার ছেলেটাকে পর করে দিলে।'

'ঠিক বলেছ। ছামুতে দাঁড়িয়ে বলে আসব। আর ও যা বলল চাল-ডাল…'

'দিই না তো কি? না খেয়ে বেঁচে আছে, না বেঁচে থাকে?'

'নবীন যা একরোখা…'

'বড্ড গোঁয়ার হয়েছে।'

কারণে বা কারণ ব্যতিরেকে মানুষ মাঝে-মাঝে আশ্চর্য সুখের অনুভূতিতে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে যেতে পারে। দীর্ঘদিনের অল্পাহারে মাথার অবস্থা যখন সদাই ঝিমঝিমে ও ধোঁয়াটে, তখন উক্ত প্রকার ইউফোরিয়া সহজেই আক্রমণ করতে পারে।

ওর‌ও সেই অবস্থা। দীনুর মূর্তি বসবে গ্রামে—দীনুদের ভিটের নতুন চেহারা—এ সকল থেকে সহজ সিদ্ধান্ত, নতুনকালে উত্তরিত হতে চলেছে গ্রাম। অতীত থেকে বর্তমানে পৌঁচচ্ছে। ফল—ওর মনের স্বপ্নিল নেশার অবস্থা। অল্পাহারে মাথার অবস্থা এমন, প্রায়ই মনে হয় ও ভেসে যাচ্ছে, হাঁটছে না। এখন ও প্রায়ই যায় ঠাকুর-বাড়ির সামনে। দু'চোখ ভরে দেখে ঝকঝকে লেপা-পোঁছা প্রশস্ত ভূখণ্ড। চারদিকে ঘোড়াসিজের বেড়া। দেখে-দেখে চলে আসে।

ঘরে এসে রাঁধতে-বাড়তে রোজ ইচ্ছে যায় না। একটু ছাতু

খেয়ে শুয়ে পড়ে। নবীনের কিনে দেওয়া চাদরটিতে হাত বোলায়। সেদিন গায়ে দেবে চাদর, যেদিন দীনু ভিটেয় ফিরবে। নবীন বলেছে, মূর্তি নয়, রাস্তাটি হবে দীনু ঠাকুরের আসল স্মৃতিরক্ষা, তাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানান। সে কোনো এক সময় তার সমসময়ের দিনবদল ঘটাতে চেয়েছিল। তার সময় এবং আজকের সময়, এ গ্রামে এক চেহারায় থেকে গেছে। রাস্তা হলে সব বদলে যাবে। তাতেই দীনুকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানান হবে। মূর্তি স্থাপনা, নবীনের মতে গৌণ, মুখ্য হলো রাস্তা। কথাগুলি আজ তারও কথা। ও জানেও না, কবে থেকে নবীন ওর কাছে আরেক চেহারায় দীনুর মতোই দরকারী হয়ে উঠেছে।

নবীন বলেছে, 'পথটির নাম হবে শহীদ দীনদয়াল ঠাকুর রোড়। পথ হলেই গ্রামে ক্রমে-ক্রমে ইস্কুল, হেল্‌থ-সেন্টার, সব হবে। ইস্কুলের নাম—"দীনদয়াল স্মৃতি বিদ্যালয়"।'

ও খুব হাসে। সস্নেহে। ওর নিদন্ত মুখে, শীর্ণ শরীরে, সাদা নুড়ি চুলে, লক্ষ রেখা-বলয়িত কপালে, গালে, মমতামাখা চোখে সে হাসি বড় অপরূপ ও বেদনাসঞ্চারী। নবীনের বুক ছিঁড়ে যায় ব্যথায়। পিসি যেন অবহেলিত মাটি। অনাদরে তৃষিত থেকে এমন ফাটা-চটা চেহারা। তবু অভিযোগ জানে না। তৃষিত মাটি যেমন স্নেহ-কাঙালপনায় একটু জল পেলেই ঘাসে সেজে ওঠে, পিসিও তেমনি, নবীনের কাছে একটু ভালবাসা পেতেই সর্বদা নিজেকে ঢেলে দিতে চায়। সদাই হাসিমুখ, যেন রাজ্যের ঐশ্বর্য পেয়ে গেছে পিসি।

রাজবংশেরই মেয়ে তো! দাসু সোরেন, রতন নাপিত, সদন খাঁ, মুরারিবাবু, সবাই মনসামেলায় দেখা শৈশব স্মৃতি থেকে বলেছে, পিসি নাকি ভারি রূপসী ছিল। দেখে মনে হতো দেবদেবীর ঘরের মেয়ে! কি চলাফেরা! কেউ কখনো মন্দ কথা বলতে পারে নি। যা হয়ে যায়, তা নেহাত নিয়তির চক্রে।

পিসিকে আরো ভালবাসে নবীন। বাবার মতো পিসি কখনো

হাত এগিয়ে দিয়ে মান্ধাতার আমলে খাওয়া ঘিয়ের গন্ধ শোঁকায় না। পিসির কথাই সত্যি। পিসি বলে, 'কবে কি ছিল, আমি কেন, আমার বাপ-ঠাকুর্দা, কর্তা-ঠাকুর্দা, কেউ দেখেননি। হ্যাঁ, জমিজমা দেখেছি, তেমন জমিজমা তখন অনেকেরই থাকত। পাটকের মিশ্রবাড়ি দীনুর দিদির বিয়ে হয়। মিশ্রদের জমিজমা অনেক বেশি ছিল।'

নবীন কোনদিন দাঁড়াতে পারলে পিসিকে নরম বিছানায় শোয়াবে, আস্ত কাপড় পরাবে, নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবে, ফাটা পায়ে তেল মাখিয়ে দেবে, তেল দেবে মাথায় মাখতে। ঘরে জ্বেলে দেবে কেরোসিনের লণ্ঠন। কবে কি হয়েছিল, জাতে-ধর্মে বেধেছিল, তার জন্যে পিসির জীবনটা নষ্ট করে দিল সবাই মিলে। কতগুলো জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ঠাকুর পরিবারটা উৎখাত কি জন্যে? বামুনের ছেলে ভুঁইয়া মেয়েকে ভালবেসেছিল বলে। এমন বিয়ে আজকাল এদিক-ওদিক হচ্ছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় কি?

পিসিকে দেখলে নবীনের মনে রাগ জ্বলে ওঠে। কোনো নালিশ নেই পিসির। পিসি শুধু সইতে এসেছিল। নবীনের বাপ-ভাই যে এমন দুর্ব্যবহার করে, সেও যেন ওর পাওনা। সব পাওনা কি করে একা পিসির হলো? কার বিচারে?

ও জানতেও পারে না, ওকে নিয়ে কত ভাবনা নবীন ভাবে। ও আপন ভাবনায় বিভোর হয়ে সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরে। জানতেও পারে না, সন্ধ্যের আলোয় ওকে কি রকম দেখায়। গ্রাম-দেবী যেন, গ্রামের আত্মা। একটু মনোযোগ আর যেন স্নেহ আর মমতা চেয়ে চেয়ে সমাজের কাছে, গ্রামটাও তো বুড়িয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ওর ফুরফুরে চুল বাতাসে ওড়ে।

ওর ঘরের ছামুতে যখন সদানন্দ এসে দাঁড়াল, প্রথমটা ওর বিশ্বাস হয়নি।

'দিদি।'

'কে?'

'আমি' সদা।'

'সদা?'

'সদানন্দ। নবীনের বাপ।'

'নবীনের কিছু হয়েছে?'

'না। এদিকে শোন।'

'তুমি···তুমি···যা বলবার, ওখান থেকে বল। আমি শুনতে পাব।'

'দীনু ঠাকুরের মূর্তি বসছে।'

'জানি।'

'তোমার তো আগে জানার কথা। নবীন আছে না? সে যাক্‌গে। আমার কথা হলো, মূর্তি হলে বসুক। যা হবার হোক। কিন্তু তুমি সামনে যাবে না। কারুকে কিছু বলবে না।'

'আমি কি বলব?'

'তখন যা হবার হয়েছে। তোমা হতে সব সর্বনাশ। বাড়ির পুজো ফেলে দিইছিল ঠাকুর-জ্যাঠা, বাবা দোই-থোই করতেও ঠাকুর নেয় নি। দেবরোষে বংশটা নষ্ট হয়ে গেল। আমরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলাম না। সে সব কথা মনে আছে?'

'আছে।'

'কোনো কথা বলবে না। কাগজের লোকরা আসতে পারে। পুরানো কেলেঙ্কারী খুঁচিয়ে তুলে লাভ নেই আর। বলতে যাও যদি, ভিটে ছাড়তে হবে মনে রেখ।'

সদানন্দ চলে গেল। ও পাথর হয়ে বসে রইল। আবার সেই সব কথা। সেই সব স্মৃতি! ও যন্ত্রচালিতের মতো দরজা বন্ধ করল। জল খেল গড়িয়ে। তারপর মাচাতে উঠে শুয়ে পড়ল।

॥ ৫ ॥

১৯২৪ সালে যা ঘটে, তা এক বহুস্তর ট্রাজিডি। এক বিস্ফোরণে বহুধা ধ্বংস। বিস্ফোরণ ঘটায় দীনু ও তার অচরিতার্থ, প্রবল প্রেম।

এবং পরে সে ব্যাপারটিই হয় গৌণ। মুখ্য হয় বহিঃপ্রকাশগুলি। যথা, দীনুর ফাঁসি—ঠাকুরবাড়িতে পুলিসের তাণ্ডব—যে তাণ্ডবের পর মহানন্দ ও দীনুর বাবার সংঘর্ষ।

পূজারী পূজিত-বিগ্রহ, পূজা-বিগ্রহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই ওর জীবনে অভিশাপ নামে। ঘটনাটি সেদিনের পক্ষে ছিল একেবারে অভাবনীয়। এতবড় সর্বনাশ যার কারণে ঘটল, সেই মেয়েকে মেরে ফেললেও মহানন্দের বুঝি শান্তি হতো না।

মনে আছে, সব মনে আছে।

দীনু চলে যাবার পর থেকে ঠাকুর-জ্যাঠার চেহারা বাজেপোড়া তালগাছ। ভুঁইয়াদের নামেও তাঁর ক্রোধ। অথচ স্থাপিত মনসার পূজারী তিনি। "না।" বলতে পারেন না। সর্বদা নাকি পিতলের ঘটের ওপর খোদিত মনসা দেবীর পঞ্চফণা মুকুট-শোভিত মূর্তিকে তিনি বলতেন, 'তোমার পুজোয় কোনো ত্রুটি করেছিলাম? কোনো ত্রুটি?'

মহানন্দ বলতেন আড়ালে, 'ঠাকুরের কোপে এমনটা হলো ওঁর। কোনো ত্রুটি করে থাকবেন নিশ্চয়। ঠাকুর বড় নির্দয়। ত্রুটি হলে তাঁর শাপ অর্শাবে।'

তারপর সেই ভীষণ, ভীষণ দিন। দীনুর ফাঁসির খবর। সমস্ত গ্রাম ঠাকুরবাড়ির উঠোনে। ঠাকুর-জ্যাঠা ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন, পুজোর পুঁথিপাটা, পিতলের দেবীমূর্তি মাথার ওপর তুলে ধরলেন। তারপর নিরশ্রু হাহাকারে আকাশ দীর্ণ করে বললেন, 'কয়েক পুরুষ ধরে তোমাকে পুজো করলাম মা, ছেলেকে বলি নিলে? এ হাতে আর তোমার পুজো করব না।'

ঠাকুর, ভুঁইয়াবাড়িরই ছিলেন। সে সময়ে মহানন্দের ভাই বউয়ের মেয়ে হয়, বাড়িতে জন্মাশৌচ ছিল। মনসা অত্যন্ত কোপন-স্বভাবা দেবী বলে ছুতোনাতায় ঠাকুর-বাড়ি তাঁকে নিতে হতো।

ঠাকুর-জ্যাঠা বলেন 'পুজো করব না', আর মাথায় ঠাকুর ধরে যেন

ছুটতে থাকেন ভুঁইয়াবাড়ির দিকে। চেঁচাতে থাকেন 'মহানন্দ।' 'মহানন্দ।' 'মহানন্দ।'

মহানন্দ ছুটে বেরিয়ে আসেন। দেখেন ঠাকুর মাথায় তুলে ধরে পুরোহিত ছুটে আসছেন। এতক্ষণ দীনুর ফাঁসির খবরে তিনিও স্তম্ভিত ছিলেন আঘাতের প্রচণ্ডতায়। এখন পুরোহিতকে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেখে দীনুর কথা ভুলে গিয়ে তিনি চেঁচান। 'অশৌচ। অশৌচ! ঠাকুর আনবেন না'—এবং তখনি খেয়াল হয়, তাঁর যদি জন্মাশৌচ হয়, ঠাকুর মহাশয়ের মৃতাশৌচ। মৃতাশৌচ নিয়ে বিগ্রহ ধরে উনি সর্বনাশ করলেন। আবার মনে হয় ওঁর বাড়িতে মৃতাশৌচ। মনসাকে আর 'শুচি রাখা গেল না।'

তাঁর এ সব মনে হতে-না-হতে, মনে হওয়া ফুরোতে-না-ফুরোতে ঠাকুর-জ্যাঠা ঢোকেন। ডুলালী স্থাণু। দরজার ঝনকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। সব দেখছে।

ঠাকুর-জ্যাঠা উঠোনে ঠাকুর ফেলছেন, পুঁথিপাটা। বলছেন, 'ঘর ফিরে দিলাম মহানন্দ, ঠাকুর ফিরে দিলাম। আমার ছেলেকে তুমি খাওয়ালে ওই মেয়েকে দিয়ে। তোমার ঠাকুর পুজো করব না, তোমার জমিতে থাকব না। অভিশাপ দিচ্ছি, নির্বংশ হও, নির্বংশ হও, নির্বংশ হও।'

'বংশের বিগ্রহ অশুচ উঠোনে ফেলে দিলেন?

'বংশের বড় ছেলেকে ডোম ফাঁসি দিল না?'

'এ আপনি করতে পারেন না।'

'করলাম তো।'

'আমাকে পাতকী করবেন না দাদা, পাতকী হবেন না। ঠাকুর ফেলে দিলে আমি কোথা যাব?'

'পাপে সব ডুবে গেছে মহানন্দ, ও ঠাকুর-পুজোয় আর আমি-তুমি রক্ষা পাব না।'

'দাদা।'

'না।'

পইতে হাতে ধরে 'না-না-না' বলতে বলতে তিনি ছুটে চলে যান। মহানন্দ হা-হা-হা করে উঠোনে পড়ে কাঁদেন। ঘট-মনসা তুলে ধরে বলেন, 'তোকে ফেলে দিল মা? ফেলে দিল?'

তারপরই চোখ পড়ে মেয়ের উপর। 'সর্বনাশী!' বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। বড় ছেলে শ্যামানন্দ ঠাকুর ঘট ও পুঁথিপাটা তোলে। ভুঁইয়াবাড়ির মেয়েরাও কান্নার রোল তোলে। ভীষণ, ভীষণ সর্বনাশের স্মৃতি সব।

মহানন্দ ঠাকুর-জ্যাঠার কাছে যেতে থাকেন, যেতেই থাকেন। ঠাকুর-জ্যাঠা তাঁকে ঢুকতে দেন না।

তারপর একদিন পুলিশ আসে। কর্ণাবতীর সোঁতা পেরিয়ে পুলিশ আসার দৃশ্যটি এ গ্রামের মাঝিপাড়া আগে দেখে ও তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বনে পালায়। পিছনে আসে একটি হাতি। হাতিটা পাট্টকের জমিদাররা প্রজাবর্গের ঘর ও গোলা ভাঙতে ব্যবহার করেন।

পুলিশ ও হাতি সিধে ঠাকুর-বাড়ির দিকে আসতে থাকে। অসমর্থিত রিপোর্ট: বদন খাঁ আঙুল দিয়ে ঠাকুর-বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে কর্ণাবতীর সোঁতার পাড়ের টিলার জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে ও ওদিকে যখন পুলিশ তাণ্ডব চালায়, সে সোঁতা বেয়ে কিছুদূর গিয়ে পাড়ে উঠে পাট্টকে পালায়। বদন খাঁর পায়ে না-কি নাগরা জুতো ছিল।

তারপর সকলকে স্তম্ভিত করে দারোগা মূর্ছিতা দীনুর মাকে টেনে বের করে, দু-বছরের বোন কোলে বুড়ী দাসীকে। দীনুর ছোট ভাইদের, ঠাকুর-জ্যাঠাকে টেনে বের করে ছুঁড়ে ফেলে। তিনি থুবড়ে পড়েন ও উঠে দাঁড়ান যখন, দেখা যায় তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। গৌরদেহে রক্তের উপবীত। গ্রামের সকলকে ঠেলে মহানন্দ ছুটে আসেন, সঙ্গে সকলে।

ঠাকুর-জ্যাঠা হাত তুলে বলেন, 'দূরে থাক। ছুঁয়ো না। আমি অপবিত্র।'

স্ত্রীকে তুলে ধরেন, ছেলেদের, বুড়ী দাসীকে। বলেন, 'কেউ কেঁদ না, যে কাঁদবে, তার গলা কেটে ফেলব। দেখার সময় পড়েছে, দেখে যাও।'

শিক্ষিত হাতি মাহুতের ডাঙশ খেয়ে ঘর ভাঙতে থাকে। বাইরে আছড়ে পড়ে বাসন-কোসন, দড়ির আলনা, কড়ির শিকে, খাট, জল-চৌকি, ঠাকুর-বিগ্রহ, সিংহাসন, চালের ডোল, ডালের কলসি।

মহানন্দ ছুটে যান কি বলতে দারোগাকে, ঠাকুর-জ্যাঠা বলেন, 'কিছু বোল না। যাক্, সব যাক্।'

আগুনে পড়ে খড়ের চালে। ধান গোলায়। নতুন খড় ও হৈমন্তিক ধান পুড়তে থাকে মহাসমারোহে। গ্রামের লোকেরা আর থাকতে পারে না। 'কার দোষে কার শাস্তি' বলে চেঁচিয়ে বিলাপ করে তারা।

তারপর ঠাকুর-জ্যাঠা দারোগার সামনে মাথা পেতে দিচ্ছেন, বলছেন, 'ছেলে গেল' ঘর গেল। আমার উপর দিয়ে দয়া করে হাতি চালিয়ে দিয়ে যাও, তোমার পায়ে পড়ি।'

দারোগারা চলে যাচ্ছে, চলে গেল। দারোগা বলে যাচ্ছে মুখ ফিরিয়ে, 'সরকারের চাকর বটি, গু-খাওয়া কাজ করতে হয়, দোষ নেবেন না।'

গাছের নিচে কপালে হাত রেখে ঠাকুর-জ্যাঠা, স্থাণু। দাঁড়িয়ে আছেন। মহানন্দ পা ধরে পড়ে আছেন। ব্রাহ্মণের পায়ে মুখ ও মাথা ঘষছেন। বলছেন, 'ঠাকুর ফিরে নিন দাদা। নতুন ঘর এখনি তুলিয়ে দিচ্ছি। নতুন জমি দিচ্ছি। আমার সর্বনাশ হবে দাদা! পুজারী বিগ্রহ ফেলে দেয় এ কখনো ঘটে নি।'

'কেন? তিনি আমায় ফেলতে পারেন, আমি পারি না? আমাকে তিনি বুকে জীয়ন্তে চিতা জ্বেলে দিতে পারেন, আমি তাঁকে ফেলতে পারি না?'

'দেবতা মানুষকে নির্দোষে মণ্যি দেয়, মানুষ কবে দেবতাকে ফেলেছে?'

'আমি ফেলে দেখালাম। আমি কি ব্রাহ্মণ আছি যে, ঠাকুর

পূজব? আমার দীনুকে ডোম ফাঁসি দিল, ডোম লাশ জ্বালাল, আমার মধ্যে ব্রাহ্মণ কোথা? তোমার সামনে সেপাই-পুলিশ আমার বউয়ের গায়ে হাত দিল। আমাকে টেনে ফেলল, রাধাগোবিন্দের সিংহাসন হাতির মুতে ভেসে গেল। তারপর ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ থাকে? বল? তুমিই বল।'

'আমার সর্বনাশ হবে দাদা। পা ধরি আপনার ধুলো খাই, ধুলো খাই দাদা, ঠাকুর ফিরে নিন, আমাকে পাতকী করবেন না।'

ঠাকুর-জ্যাঠার চোখ ভীষণ আনন্দে নেচে ওঠে। তিনি বোঝেন ঠাকুর প্রত্যাখ্যান করলে মহানন্দকে সবচেয়ে বড় ঘা দেওয়া হবে। তিনি গম্ভীর পরুষ-রুক্ষকণ্ঠে বলেন, তোমার মেয়ে যে বেঁচে আছে মহানন্দ। সন্তান শোক তো পাওনি, তাতেই তোমার কি সর্বনাশ হবে তাই ভাবছ। কেন ঠাকুর নেব তোমার? তোমার বিগ্রহ? হোক, সর্বনাশ হোক। এতে যদি সর্বনাশ হয় তোমার, তাতে আমার তিলেক হলেও শান্তি হবে। মেয়েকে দিয়ে আমার এতবড় সর্বনাশটা করালে।'

সব মনে আছে। মনে থাকবে। ঠাকুর পরিবারে দুলালী বিষ, দীনুর মৃত্যুর জন্যে। এ-পরিবারে দুলালী বিষ, দেবরোষ, ব্রহ্মরোষের জন্যে।

এতকাল পরে সদানন্দ এসে আজ ওকে সে সব কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

বেদী তৈরি হলো, প্রশস্ত, চৌকো, সুউচ্চ। নিচে খোদাই করে লেখা হল:

শহীদ দীনদয়াল ঠাকুর

(১৯০০—১৯২৪)

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

কথাটি "যে করিবে" না "করিবে যে", তা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কিন্তু হাতের কাছে 'চয়নিকা" বা "সঞ্চয়িতা" না থাকায় ওটি চেক করা যায় নি।

বেদী হলো। তারপর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এক কাঁচা রাস্তা। সদানন্দ বলল, 'এই কি তোমার দীনদয়াল রোড?'

'না। এতে জীপ-ট্রাক আসবে।'

'এই রাস্তা করেই কলা দেখাবে সরকার।'

'দেখা যাবে।'

'তারপর ইলেকট্রিক আসবে না?'

'আসতে পারে।'

'তোমার থেকেই গ্রামের সর্বনাশ হবে। তোমার পিসির কারণে একবার হয়েছিল। এবার তোমার কারণে হবে।'

'আপনি বলে ছেড়ে দিলাম। আপনার ছোট ছেলের মুখে পিসির নাম শুনলে মুখ থেঁতলে দিতাম।'

'নয় বাপের মুখটাই থেঁতলে দাও?'

'ভাববেন না সে-ইচ্ছে হয় না।'

নবীন এ-হেন কথা আজকাল প্রায়ই বলছে। কথাগুলি সদানন্দ প্রোভোক করে। ফলে পিতা এক ধরনের আনন্দ পায় এবং ছেলে নিজে প্ররোচিত হলো বলে গ্লানিবোধ করে।

এরপর সদানন্দ আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না। বলে, 'ট্রাক ভেঙে যাবে নবীন। ও মূর্তি গ্রামে এসে পৌঁছুবে না।'

'তেমন হলে আপনি খুশি হন, কিন্তু তা হবে না। পুলিশ আসছে মূর্তি নিয়ে, পাহারা দেবে, যত্নে আনবে।'

'পুলিশ!'

'নিশ্চয়। মন্ত্রী মূর্তির আবরণ উন্মোচন করছেন।'

'পুলিশ! মন্ত্রী! পুরুতের ব্যাটা, হা-ঘরে বামুন, করল ডাকাতি, ফাঁসি গেল, তাকে নিয়ে এত নাচন।'

'আপনার জন্যেই রাস্তাটা দরকার বাবা। রাস্তাটা হলে আপনাকে বাইরের জগৎটা দেখিয়ে আনব। ভূঁইয়া রাজাদের রাজত্বের বাইরেও জগৎ আছে, দেখে আসবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা আছে, মানসিংহের তরোয়াল আর পাট্টা... ক'জনার ঘরে আছে ?'

'কল-কারখানা আছে, ধানের জমিতে গম ফলছে, ডোম চাঁড়াল ইস্কুল-কলেজে পড়ছে, দেখার জিনিস আরও আছে। পাট্টা আর তরোয়াল? এই মেদিনীপুর খুঁজলে আজও ওরকম পাট্টা আর তরোয়াল হাজারটা মিলবে।'

বাপকে দেখিয়ে নবীন পিসির ঘরে চলে যায়। বাপকে শুনিয়ে হেঁকে বলে, 'মুসুর ডাল আর আলু-পেঁয়াজটা রেখে দাও পিসি। চালে-ডালে ফুটিয়ে নাও তো! আজ তোমার ঘরে খাব।'

নবীনের মা পেতলের ঘটের সামনে কেঁদে পড়ে। সদানন্দ বলে, 'তোমাকে ফেলে দিয়ে দীনুর বাপ এমন অপমান করলে, তুমি কি এই কলিতে ক্ষমতা হারিয়েছ মা? দীনুর মূর্তি বসছে গ্রামে, কিছু করতে পার না?'

পেতলের মনসা, আড়াইশো বছর ধরে পেতলের নিস্পৃহ ড্যাবডেবে চোখ মেলে ভক্তদের প্রার্থনা শুনে যাচ্ছেন। এখনও শোনেন।

সদানন্দর প্রার্থনায় কিছুই হয় না। মূর্তি স্থাপনার দিন আসে। অবশেষে একদিন কাঁচা রাস্তার দু-ধারে ছাতিম ও অন্য সাতটি গ্রামের বাসিন্দারা দাঁড়ায় সার-বেঁধে। পি. ডবলিউ. ডি. রোডওয়েজ-এর ট্রাকে চড়ে, পুলিশ পাহারায় মৃত্যুর চুয়াম্ন বছর বাদে ঘরে ফেরে ব্রোঞ্জ-কঠিন দীনদয়াল ঠাকুর। এতকাল বিস্মৃত ও সহসা পুনরাবিষ্কৃত শহীদ ফাঁসির দড়ির চেয়ে অনেক শক্ত দড়িতে বেঁধে তাকে বেদীতে তোলা হয়। পায়ের নিচের চৌকো পাদপীঠ বেদীর গহ্বরে বসিয়ে সেটি কংক্রীট ঢেলে সুরক্ষিত করা হয়। সদন খাঁর সাপ্লাই করা ফুল

ম্যাগাজিনের ফটো খুব বিশ্বাস্য ছিল না। ফলে দীনুর চেহারার কঠিন, দৃপ্ত ভাব, আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ—শান্ত ও গম্ভীর উদাসীন দৃষ্টি সংবলিত এক নতুন দীনুতে রূপান্তরিত হয়। চেরা সিঁথির দু-পাশে পাট-করা চুল, গায়ে পিরাণ, পরনে ধুতি, কাঁধে উড়নি, দীনুর মূর্তিটি উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখে আশ্বস্ত হয় যে গ্রামটি সে যে অজ্ঞান-দারিদ্র্য-অনুন্নতির অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে গিয়েছিল, গ্রামটি তেমনই আছে। তারপর মূর্তিটি সেলোফেনে মোড়া হয়।

হ্যাজাক জেলে পুলিশ মূর্তি পাহারা দেয়। ওদের কড়া নির্দেশ আছে, ফলে ওরা ওদের আনীত চাল-ডাল রেঁধে খায় ও ডিউটি-বদল করে ট্রাকে শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়।

পরদিন দশটা না বাজতে সার-সার জীপ আসতে থাকে। নবীনদের খাটান, পঞ্চায়েতী পয়সার আনীত মস্ত চাঁদোয়ার নিচে সদন খাঁ প্রদত্ত চেয়ার পড়ে, শতরঞ্চি, পাটকে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা "জনগণ" গাইতে আসে। রিপোর্টার, মাইক, মূর্তির এবং মন্ত্রীর জন্যে মালা, মাননীয় অতিথিদের জন্যে চা মিষ্টি, অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকে না কোন।

নবীন বলে, 'যাবে না পিসি?'

ও বলে, 'না নবীন, তোর পায়ে ধরি।'

'কেন যাবে না?'

'পরে দেখে আসবখন।'

'তুমি কাঁদছ?'

'কাঁদব না? সেদিন সবাই তাকে খ্যাপা কুকুরের মতো মেরে তাড়িয়ে দেয়।···কপাল কেটে গিয়েছিল···আজ তাকে তুই কত সম্মানে···।'

নবীন চলে যায়। নবীন বলতে পারে না, সমগ্র ব্যাপারটিতে তার ভূমিকা বরাবরই গৌণ ছিল। আজকের অনুষ্ঠানও বাইরে থেকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। রিপোর্টার, সরকারী লোকজন, কেউ তাকে

পাত্তা দিচ্ছে না। এম. এল. এ. এবং মন্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলছেন। সেও জনসংযোগ রাখার খাতিরে।

আগে চাঁদোয়ার নিচে বক্তৃতা হয়। নবীন গ্রামের হয়ে আবাহন করে মন্ত্রী, সদন খাঁ, এম. এল. এ.-কে—চেয়ারে বসায়। অন্যান্য মাননীয়েরা চেয়ারে বসেন।

গানের দল শতরঞ্চিতে সামনে। গ্রামবাসীরা শতরঞ্চি উপচে চারিদিকে। লক্ষণীয় অনুপস্থিত ব্যক্তি সদানন্দ। রতন নাপিতের পিলে-পটকা আট-বছুরে মেয়ে মীরা,—গোলাপী ও সস্তা নাইলনের ফ্রক পরে, তেল-চকচকে-চুলে রিবন বেঁধে মাল্যদান করে মন্ত্রী—সদন খাঁ ও এম. এল. এ.-কে। ফলে পি. ডবলিউ. ডি. রোড্‌স-এর অফিসারের মালা জোটে না।

অতঃপর মন্ত্রী, এম. এল. এ. ও সদন খাঁ, দীনু-ঠাকুর বিষয়ে মস্ত-মস্ত ভাষণ দেন। সমাপ্তিতে নবীনকে কিছু বলতে বলা হয়। নবীন ধন্যবাদ জানিয়ে যখন বলে, 'এরপর, এঁদের কৃপায় আমরা রাস্তা পাচ্ছি, শহীদ দীনু ঠাকুর রোড...' তখন সহসা এম. এল. এ. ওর শার্ট ধরে টানেন। নবীনকে টেনে বসিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'রাস্তা নির্মাণ নিয়ে আমারও আগ্রহ আছে। কিন্তু বর্তমান সরকারকে বহুবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। ফলে এখনি কোনো প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি আনা যাচ্ছে না। এই রাস্তা তৈরি হওয়া আবশ্যক এবং আমি মহান মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি, ভবিষ্যৎ প্রকল্পে যেন রাস্তাটির কথা বিবেচনা করা হয়।'

নবীন প্রোটোকল ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'রাস্তা হবে, স্কুল হবে, হাট বসবে, হেল্‌থ সেণ্টার হবে বলে আপনি কথা দিয়েছেন।'

'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ো না নবীন। সরকারকে টিকতে দাও, সব হবে।'

এখানেই প্রমাণ হয়ে যায় নবীন গ্রামীণ ছেলে। শহুরের মিলিটান্‌স্‌ ও উপস্থিত বুদ্ধি তার নেই। কেন না তার চোখে জল

ঝরে পড়ে এবং সে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে। গ্রামবাসীদের দিং মন্ত্রীকে ঘিরে ফেলে, 'রাস্তা করে দিতে হবে। আমাদের দাবী মানতে হবে।' বলে কথা আদায় করাবার কথা তার মনেও আসে না।

টাউনের মুরারিবাবু ও গ্রামের রতন নাপিত তার দু-হাত ধরে বলে, 'নবীন। এখনকার কাজ এখন হোক। এত সহজে কাজ হয় করে ওরা? দেখা যাবে। আজ না হোক, কাল হবে।'

নবীন হাত ছাড়িয়ে নেয় ও মন্ত্রীকে বলে, 'দেখুন। দীনু ঠাকুর যখন গ্রাম ছেড়ে যায়, তখন গ্রামে স্কুল ছিল না, পথ ছিল না, আমরা মৌয়া তেলে বাতি জ্বালতাম। আজও কিছু নাই গ্রামে, তফাতের মধ্যে কেরোসিন জ্বালি। পথ একটা! তার ব্যবস্থা না হলে...'

'মনে রাখব।'

সবাই উঠে পড়েন ও মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার দিকে এগোতে এগোতে মন্ত্রী সদন খাঁকে বলেন, 'রাস্তার কথাটা সত্যি। কিন্তু সে কথা তো আপনি...'

সদন বলে, 'আমাদের কাছে দীনু ঠাকুরের মূর্তি হওয়াটা আরও দরকার। নইলে ভূষণ বলত না?'

'সে তো বটেই। গ্রামের শহীদ, দেশের গৌরব। তা মূর্তিও হয়েছে জবর।'

মন্ত্রী বেদীতে উঠে আবরণ উন্মোচন করেন। ছবি ওঠে পটাপট তখন হঠাৎ পাটকে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠে "জন গণ মন।"

নবীন চলে যায় নদীর সোঁতার দিকে। চোখের জল সে আটকাতে পারে না এবং শিশুকণ্ঠে "জয় হে! জয় হে!" তাকে তাড়া করতে থাকে।

সারা দিন কেটে যায়। সারা দিন পিসিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে নবীন। সারাদিন পিসি ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

'তোমায় নিয়ে টাউনে চলে যাব। মুরারিবাবু বলেছে, প্রেস ঘরে থাকতে দেবে।'

'তোর পঞ্চায়েত?'

'এসে কাজ করব।'

'তাই যাস।'

'তুমি যাবে তো?'

'যাব। তোর সঙ্গে যাব ভাবন। কি?'

'এখানে একা আধপেটা খাও, ওখানে দু'জনে তাই খাব।'

'তাই হবে।'

'মুরারিবাবু বলেছে, বুড়ো হয়েছে, সব সামলে রাখতে পারে না। আমি দেখব প্রেস। কাজ আসে অনেক। আমিও কাজ করব, কমিশন দেবে।'

'তাই হবে। তোর বাবা?'

'এদের অন্ন আর খাব না।'

সন্ধ্যে হলো। তারপর নবীন দেখে, পিসি উঠে ফরশা কাপড় পরছে, চুলে চিরুনি দিচ্ছে, গায়ে ওর দেওয়া চাদরটা জড়াচ্ছে।

'কি হল?'

'ওঠ।'

'কেন?'

'আমি একবার দেখব না?'

'তোমাকে ওরা একবার দেখতে চাইল না?'

'তুইও যেমন।'

'কত কথা বলল, ওরা কি তাকে জানত?'

'তারাই তো বলে রে। তোর বাপ তোকে মন্দ দেখে, মন্দ বলে, সেই কি তোকে জানে?'

সারা দিনের মধ্যে, এই কথা কয়টিতে নবীন যত সান্ত্বনা পেল, মুরারিবাবুর শত আশ্বাসে পায় নি। গ্রামের লোকেরা ওকে

বলেছে, তোমার কথায় কাজ হলো না, তাতে আমাদের এতটুকু বিশ্বাস টলে নি তোমার ওপর। নবীন তবুও লজ্জার বোধ কাটাতে পারে নি। ওদের প্রবক্তা হয়েও কিছু করতে তো পারল না। ওর মন বলেছে, যদি নবীন ভুঁইয়া হই, তবে পথ আমি করাব। তবু দুঃখ বেদনা—আশাভঙ্গের বেদনা কি সহজে যায়?

নবীন টর্চ নিল। ওরা দু-জন ঘর থেকে বেরোল। মূর্তির সামনে এসে পিসি দাঁড়াল। আস্তে মুখ তুলল। নবীন টর্চ ফেলল

'এই এত বড়! এত উঁচু নবীন? আকাশ দেখা যাচ্ছে পেছনে?'

নবীন এখন পিসির চোখ দিয়ে দেখছে। খুব বড়, খুব উঁচু রাতের আঁধারে। ব্রোঞ্জের চোখ দুটিতে মানুষী বেদনা ও মমতা।

'আমাদেরকে দেখছে, দেখ নবীন!'

'হ্যাঁ।'

দেখে নিল পিসি চোখ ভরে। এগিয়ে গেল। মূর্তির পায়ে হাত বোলাল। অদ্ভুত, অজানা অনুভূতি। কোনমতেই এই সুউচ্চ মহান মূর্তিটিকে সে দীনুর সঙ্গে মেলাতে পারছে না কেন? দীনু কি ঠাকুরদেবতা হয়ে গেল? মনসার থানের মতো?

'পিসি ঠাণ্ডা লাগবে।'

'হাঁা, চল্ যাই।'

ওর পিসি হঠাৎ ওকে অবাক করে বলল, নিরশ্রু দুঃখে বলল, 'পায়ের কাছের ফুলগুলো যে এখনি শুকিয়ে গেছে নবীন? মাথায় কাগে হাগবে, ধুলো ময়লা পড়বে, মনসা থানে সম্বচ্ছর ঠাকুরের দুর্দশা দেখিস নি?'

পিসিকে সযত্নে কাছে টেনে নিয়ে হাত ধরে বাড়ির দিকে চলতে চলতে নবীন বলল, 'মূর্তিতে-পথে-শ্মশানে চুয়াত্তর হাজার আট শো একান্ন টাকা খরচ করল পিসি। এ টাকায় গ্রামটাকে সোনা দিয়ে

মুড়ে দিতে পারত পিসি, পথ হলথ সন্টার-স্কুল, স—ব হতো। আর মানুষগুলো। বেঁচেও মরে থাকল এদিকে।

ওদের পেছনের মূর্তিটি একই মহিমময়তায় দাঁড়িয়ে থাকল। ও দীপু নয়, ও মূর্তি। গঠনে-স্থাপনে-উদ্বোধনে পরবর্তী অবহেলায় মূর্তির কিছু করার থাকে না। অথচ মূর্তির জন্যে নবীনদের জীবনে ভীষণ আশাভঙ্গ ঘটতে পারে, নবীনের ঘটেছে।

নবীন ও পিসি অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে থাকে।

মোহনপুরের রূপকথা

মোহনপুরের রূপকথা একা আন্দি বুড়ী জানে। সে রূপকথায় মোহনপুরের ঘরে ঘরে ধানের গোলা, গোয়ালে গরু। সে রূপকথায় বেহুলা এক বহতা নদী। সে নদীতে জেলে জাল ফেললেই রুপোলি মাছ ওঠে জলের ফসল।

সে রূপকথায় উপোস নেই, আকাল নেই, জোদো নস্করের দাপট নেই, বর্গাদারের অসহ কষ্ট নেই, রোগ নেই, জরা নেই।

রূপকথার মোহনপুর আন্দি বুড়ী স্বচক্ষে দেখে নি। ওর পূর্বপুরুষরাও দেখে নি। সে মোহনপুরও বাস্তবে ছিল না। বেহুলা যখন স্রোত বদল করে, তখনি সে অবাস্তব মোহনপুর জলের নিচে গেছে। তবু আরেক মোহনপুর গড়ে উঠেছে।

এ মোহনপুরে স্বভাব দারিদ্র্য। কলকাতা থেকে ট্রেনে দু ঘণ্টা এলে ইবকানপুর স্টেশন। স্টেশনে নেমে পুবে গেলে বেহুলা গ্রাম। পুবে খানিক পথ গিয়ে দক্ষিণে ঘুরে যেতে হয়। তিন মাইল হাঁটলেই মোহনপুর গ্রাম। জেলে-তিওর কাওরার গ্রাম। সব পথই নস্করের ধান খেতের মধ্যের আলপথ।

আন্দি বুড়ীর কোমর পড়ে গেছে। চোখে দৃষ্টি ক্ষীণ। সারাদিন ও থানকুনি পাতা, ডুমুর, দুবো ঘাস তোলে, মজা পুকুর ছেঁচে গুগলি জেলে পাড়ায় দুর্গা, বাতাসীকে দেয়। ওরা শেষ রাতে আলপথ ধরে ছোটে ও কলকাতার ট্রেন ধরে। বিকেলে ফিরে আন্দিকে পয়সা বুঝিয়ে দেয়। নিজেদের পয়সা কেটে নেয়।

দুর্গা বলে 'চার ছেলে থাকতি খেটে মত্তেচ ক্যান মা ?'

আন্নি বলে। 'পেট চলে নে মা। ওরা কি বলে, মা তুমি খাট ? ওরা তো ঝা পারে কত্তেচে। ই কি দিন হলো মা ? ঝা আনত্তেচে, সব ঝে চাল কিনতি যাচ্ছে।'

'চাল বা কোত্তা ? সকল চাল তো কলকাতায় চলে যাচ্ছে। আতে-দিনে চাল বাইত্তেচে মানুষ।'

'ই বা কেমন বিচার ? দেশে বসে পাঁচ টাকা পালি চাল কিনতি পারে কেউ ?'

'আর মাসি ? আমরা চেরকাল তুকু করে ঝাব।'

নিত্যি গাড়ি ঠেঙিয়ে ঝাব-আসব, ট্যাকে আনব পাঁচটা টাকা। তাতে পেট পোষে ? ঘরে সাতটা মুক।'

'আগে এমন ছিল নে। তোর পিসি আম্মা পুজোয় নানা নিদি আদত্তেচে, চক্ষু মুদলি দেকতি পাই ঝে সব।'

'ওই এক কত্তা।' পিসিরা এত-এত এঁদে গেচে বলেই তো আমাদের কালে জিনিস নি। তকন কলকেত্তার নোক কি করে বাঁচত্‌ মা ? একন গেরাম ঠেঙিয়ে ঘাসপাত্তা চাল যাচ্ছে ?'

'চক্ষু মুদলি সব ঝ্যামন স্পষ্ট দেকি। চক্ষু মুদলি সব আঁধার।'

'ঝা দিন পড়েচে। চক্ষু মুদেই সব দেকত্তে হবে। পেটের ভাত পরনের বস্তর, মাত্তার তেল, চালের পোয়াল, চক্ষু মুদে দেকবে মাসি।'

'সকল ঝ্যানো ছেমা-ছেমা দেকি মা ! কেন এমন হলো ?'

বাত্তাসী এখনও নেকী আছে। সে বলল, 'ইরকানপুরে নে যেত্তে বল নাত্তিরে। ডাক্তার দেকাও, অষুদ করাও, ভাল দেকবে চোকে।'

দুর্গা রিয়ালিস্ট। সে বলল, 'মুনিবের গরু তাইড়ে নে ঝাবে কখন ? চ্যামা কত্ত। রেকে দে তুই। মাসি ? গুগলি সিজ্জে খাও। চোকে ছেমা দেখলে গুগলির ঝোল। কবরেজ বাড়ি বলতু মনে নি ? গুগলি খেত্তে বলতু ?'

অগত্যা আন্নি গুগলি তুলতে যায় এবং কি আশ্চর্য, খলখলে

একটা চকড়াবকড়া নতুন জাতের বান মাছ পায়। সেটা গামছা বেঁধে ঘরে এনে নামাতে বড় বউ গামছা খোলে। চেঁচিয়ে ওঠে। মাছটি জলঢোঁড়া হয়ে এঁকে বেঁকে পালায়।

সবাই বকে বুড়ীকে। 'বলে জেয়ন্ত সাপটা ধরলে?'

'কবে জল কেউটে ধরবে আর মরবে।'

'ইশ! বেউলোয় ছিরে মার থাকতে সাপে কেটে মরতে হচ্ছে নে।'

ছোট ছেলে অপ্রিয় সত্য বক্তা। সে বলে, 'বেউলো খেয়ে ছিরেকে খস্তে-খস্তে তুমি নরকে যাবে।'

'অ্যাঁ? আমি নরকে যাব? এত বড় কথাটা বললি?'

'বলবু নি? মাচ খাবার এমন নোলা?'

'আমি একলা খেতাম?'

'না, সবারে দিতে। বলি, মাচ আমাদের কপালে আচে যে খাব? বড় মাচ? খাল জুলি ছেঁচে পুঁটি চিংড়ি সেই ভরসা। বড় মাচের লালচ কত্তে গেলি তা সাপ হয়ে পালাবে।'

কথাটা শুনে বড় ছেলের ছেলে নোদা বলে, 'ক্যানো?'

'ঠাম্মা বড় মাচ পেলি আনবে নে?'

ছোট ছেলে বলে, 'শুয়োর ব্যাটা, মাচ খেতে যেয়ে মাওড়া হব? মাচের নোলা! যদি নাবালে জমিতি ধান হয়, যদি সে ধান নক্ষ্মী ঘরে আনতি দেয়। তবে বড় মাচ খাওয়াব। মাচের জন্যি মা হারাতে পারবু নি।'

এ হেন উদাত্ত ঘোষণায় সে মাতৃপ্রেম জাহির করে এবং খাবা খাবা পান্তিভাত খেয়ে মাঠে বেরিয়ে যায়। সমগ্র ব্যাপারটি আন্দির কাছে এখন নতুন সংস্করণের রূপকথায় উত্তোরিত হয়। আন্দি সবিস্ময়ে বলে—

'মাচ ধরলাম, তা সাপ হয়ে গেল?'

বড় বউ বলে, 'পিচলে ক্যানো?'

'গুগলি আনতি।'

'ক্যানো?'

'চোকে দেকি নি স্পষ্ট, তা গুগলি খেলে চোকের ছেমা কাটিতু।'

'গুগলি আমি এনে দেব।'

'তাই দিস।'

অত্যন্ত খুশি হয় আন্দি, ও বলে, 'আনলি তুই আনবি। তুই ছাড়া আমারে ছ্যাকে কে?'

গুগলির ঝোল খেয়েও আন্দির চোখের ছায়া কাটে না এবং থানকুনি তুলতে গিয়ে ও একদিন, মাঠভ্রমে পানাপুকুরে গিয়ে পড়ে। মেজ নাতি ওকে তোলে এবং জল থেকে উঠে সুস্থ হলে আন্দি অবশ্য বলে, 'এ রকম হবে তাও ঝানা কতা! মাচ ধল্লে সাপ হবে। মাঠে পা দিলি তা পানাপুকুর হবে।'

ছোট ছেলে বলে, 'রাকো তোমার রূপকতা। চোক্ষু ঝেয়ে কনো হচ্চ।'

'তবে আমায় হাসপাতালে নে চল্।'

'ঝাবে কি করে?'

'কেন হেঁটে?'

'বলি, ডাক্তার দেকবে ক্যানো?'

'কেন দেকবে নে?'

'গরিবরে ছ্যাকে?'

'রোসো এনায়েতরে বলি।'

'বল! এনায়েত তো গরিব দেকলি বুক পেতি দেছে। সুমুন্দি সরকারী চাগরি কচ্চে বলে...'

'মোচলমান তায়, জলপানি পাওয়া ছেলে।'

'ঝাও না তার কাচে?'

এনায়েত মাইনর পাশ করে হেদো নস্কর হেন খুঁটির জোরে হাসপাতালে পিওন হয়েছে। ঘুষ-ঘাষ নিয়ে সে রুগী দেখিয়ে দেয়

এবং গ্রামে তার প্রতিপত্তি খুব। এ বছর সে শ-খানেক নারকোল বেচেছে। অগ্নীশ্বর কলা। খড়ের চালা ফেলে টিনের চালা করেছে। ইত্যাকার কারণে সে গ্রামের সকলকে খুশি রাখে। কেন না গরিব মুসলমান পাড়ায় ওর ঘরের সম্ভ্রান্ত চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত। কঙ্কালসার ভিখিরি মেয়ের ঠোঁটে লিপিস্টিকের মতো। পাড়াপড়শির চোখ টাটান ও গায়ে টানতে চায় না। ওর অবস্থা উঠতি, তা যেমন বাস্তব সত্য, পাড়াপড়শির চোখ টাটাতে পারে তাও তেমন সত্য। সাধ্যমতো সদ্ব্যবহার দ্বারা এনায়েত দুটি বিপ্রতীপ বাস্তবতাকে ভারসাম্যে রাখে।

এনায়েতের কাছেই যায় আন্দি। বলে, 'অ এনায়েত। বিপদে পড়ে এইচি বাবা!'

'বল মাসি!'

'একন। তুমি তো হলে গে ভরসা।'

'কি বল?'

'চোকে সকল ছেমা ছেমা দেকি।'

'নন্দরে সাতে নে এস হাসপাতালে।'

নন্দর সময় হয় না। নন্দর ছেলে নোদো আন্দিকে নিয়ে যায়। অশেষ বরাত জোর আন্দির। কিছুদূর গিয়ে ওরা মতিউরের গরুর গাড়ি যেতে দেখে।

মতিউর বলে, 'চেপে পড়। বুড়ো মানুষ কৎখন ঠুকঠুক করে বা হাঁটবে?'

খড়ের ওপর বসে আন্দি হাসপাতালে আসে। ইরকানপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই বেহুলা ব্লকের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অক্ষম। বেহুলা ব্লকের অন্তর্গত সকল গ্রামের জনসংখ্যা সাত হাজার একান্ন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাসপাতালে বেড কুড়িটি, গড়ে রোগী থাকে বাট জন। এক বিছানায় একাধিক রোগী, মেঝেতে রোগীর ছড়াছড়ি প্রাত্যহিক দৃশ্য।

কুড়িটি বেড দুজন ডাক্তার নিয়োগ জাস্টিফাই করে না, ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার অনেক দিন আগেই বুঝেছেন। তাঁর একার পক্ষে আউট-ডোরের গড়ে একশো ইন্‌ডোরের ষাটজন রোগীর অপুষ্টিজনিত দুর্বল ও প্রতিরোধহীন শরীরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্রিমি, রক্তামাশয়, শোথ, যক্ষ্মা—টাইফয়েড নিউমোনিয়া এন্‌কেফালাইটিস—রক্তাল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, কাটা—লাঠির ঘা—পোড়া—সাপে-কাটা পাগলা কুকুর বা শেয়ালে কামড়ান—কানের পুঁজ—ডিপথিরিয়া—ইত্যাদির চলাফেরার গতিবিধান সাধ্য নয়।

ওষুধ বলতে হাতে পান এক গোলাপী মিক্সারের উপকরণ—এন্টেরোকুইনল, সাল্‌ফা ডায়াজিন—সাল্‌ফাগুয়ানোডিন এবং প্রচুর গর্ভনিরোধক বড়ি ব্যাপারটি নৈরাশ্যসঞ্চারী। কেননা এখানে কোন মেয়েই গর্ভনিরোধে উৎসাহী নয়। পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ নিয়ে যে সব খুটখুটে দিদিমণিরা আসে তারা রক্ত ত্রিকোণের উপকারিতা বোঝাতে গিয়ে এইভাবে ঝাড় খায়।

'তোমরা কি ঝানবে? আমাদের নোক বলই ঝহা বল। যত হয়, তত ভাল।'

'কষ্ট? কিসির? গাচের ঝেদিন ফল ধত্তে কষ্ট হবে, সেদিন ছিষ্টি উল্টে ঝাবে।'

'আমার ঝদি দশটা হয় তোমার কি?'

ডাক্তার জানেন, তাঁর অবস্থা চোদ্দ হাত জলের নিচে নিমজ্জিত জেলেডিঙির সমান। নার্স-কাম্‌-ধাত্রী তিনি পাবেন না। উক্ত কাজ করে কলকাতার হাসপাতালে ট্রেনিং নেওয়া সবে-যুবতীরা।

তারা এখানে থাকবে কোথায়? থাকার জায়গা নেই। পাকা বাড়ি ও নিরাপদ বাসস্থান না হলে তারা আসতে পারে না। স্বাস্থ্য-কেন্দ্র পাঁচিল ঘেরা বা সুরক্ষিত নয়। ডাকাতি এখানে ক্রনিক, চুরিও। বহু তদ্বির সত্ত্বেও নার্স থাকার ঘরের ব্যবস্থা করা যায় নি।

ডাক্তার বর্তমানে, সরকারের এক শুভেচ্ছার কথা জেনে শঙ্কায়

আছেন। তিন মাসের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কম্যুনিটি হেল্‌থ ওয়ার্কার তিনিও পেতে পারেন একজন।

উদ্দেশ্য মহান। কিন্তু ওষুধপাতি, ব্যাগ, মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিয়ে এই সব স্বাস্থ্য কর্মীদের ছাড়া হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে-কেন্দ্রে। তারা সরকারী স্বাস্থ্য-প্রকল্প ও জনসাধারণের প্রয়োজনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ করবে।

কার্যকালে নিয়োগগুলি রাজনীতিক বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে হবে বলে ডাক্তারের ধারণা। তা হলে পরে উক্ত শুভেচ্ছুক যুবকরা অত্যুৎসাহে আরও আরও রোগী এখানে পাঠাবে।

ভাবতে গেলেও জ্বর আসে ডাক্তারের। কলকাতা থেকে আগত ডাক্তার হলে তিনি পালাতে পারতেন মাঝেমধ্যে। তিনি সাবুদপুরের ছেলে। পালিয়ে বড় জোর সাবুদপুর যেতে পারেন। যান। রোগীরা সেখান থেকেও তাঁকে টেনে আনে।

সরকারই ডাক্তারের মনোভঙ্গের কারণ। সরকার, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য যখন রাঁধুনী স্যাংশন করে, তখন কিচেন ছিল না। এখন কিচেন হয়েছে, রাঁধুনী নেই।

রান্নার উপকরণ সরবরাহ করে হেদো নস্কর। সে যা পাঠায়, তাতে ভাগ বসায় রান্নার অস্থায়ী চাকর। রোগীরা খাদ্যের অপোলব্ধিতেই খুশি!

ডেটল—তুলো—ব্যাণ্ডেজ থাকে না। এমার্জেন্সীতে লণ্ঠন জেলে যন্ত্রপাতি গরম জলে ফুটিয়েই ডাক্তার অস্ত্রোপচার সারেন।

আশ্চর্য কি, কম্পাউণ্ডার হরি নন্দী ও পিওন এনায়েত দুজনেই রোগী দেখে?

জেনেশুনেই এরফান আন্দিকে আসতে বলে। বহুক্ষণ বসে থাকে আন্দি ও নোদো। আন্দি মাথা নাড়ে অনবরত। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রই তার চোখে এক আশ্চর্য স্বর্গ বলে মনে হয়। নাতিকে বলে, একবার ভর্তি হলি বেশ হয়। খাটে শোব, ভরপেট খাব।

'ওঃ! কত ব্যবস্থা রে নোদো।'

বেলা দু'টো নাগাদ আন্দি বুড়ীর ডাক পড়ে। বুদ্ধি করে আন্দি পেট-কোঁচড়ে চারটি ছাতু ও গুড়ের নাড়ু এনেছিল। হাতের তেলোয় চাপে তাই গুঁড়িয়ে এতক্ষণ কুপ কুপ করে খেয়েছে। নইলে বসে থাকতে পারত না ক্ষিদেয়। নোদো পয়সা এনেছিল। স্টেশন থেকে চা পাঁউরুটি খেয়ে এসেছে।

আন্দির চোখ দেখে ডাক্তার কিছুই বোঝেন না। বোঝার কথাও নয়। তিনি চোখের ডাক্তার নন। চোখের ডাক্তারদের কোন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই। মাসের প্রথম শনিবার চোখের ডাক্তার, দ্বিতীয় শনিবার দাঁতের ডাক্তার, তৃতীয় শনিবার চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, এঁদের আসার ব্যবস্থাটি কাগজে আজও বিদ্যমান। আমাদের ডাক্তার উক্ত ডাক্তারদের জীবনেও দেখেন নি।

এখন আন্দির চোখের মণিতে সাদাটে ছোপ দেখে ডাক্তারের অপরিসীম রাগ হয় এনায়েতের ওপর। ডাক্তার বলেন—

'তুমি কি মানুষকে নিয়ে মশকরা কর?'

'কেন?'

'এখানে চোখ দেখাবার কোনো ব্যবস্থা আছে?'

'দেখে দেন এট্টু।'

আন্দি কাতরস্বরে বলে, 'দয়া হবে নে? অ ডাগদার বাবু? আপনি দেকে কত ঝনার কত অসুক সাইরে দিচ্চ। আমার পরে দয়া হবে নে? সেই সকালা হতে বসে আচি, বেলা ত্যাতপ্পর হলো?'

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলেন। কাল পেটটা নামিয়েছিল। আজ একটু চিঁড়েধোয়া খেয়ে ভোর থেকে বেলা দুটো অব্দি চক্কর দিচ্ছেন। নিজের কথা আর বলেন না। আন্দির চোখ টর্চ ফেলে সযত্নে দেখেন। তারপর একটি নমুনা পাওয়া আইড্রপ দেন চোখে দিতে নমুনা-পাওয়া মাল্টি-ভিটা-বড়ি দশটি।

বলেন—'এটা চোখে দিও বুড়ী মা। এই বড়িটা দশ দিন সকালে

খেও। এখন তো হবে না। ছু-মাস বাদে এখানে অনেক ডাক্তার আসবেন। তাঁবু পড়বে, চোখ অপারেশন হবে, বুঝলে? তোমার চোখে ছানি পড়েছে বুড়ী মা।'

'তাতেই সকল ছেমা ছেমা দেকি?'

'হ্যাঁ বুড়ী মা। চোখে অস্তর করতে হবে। সে তো এখন হবে না। ছু-মাস বাদে।'

'তদ্দিনে কানা হয়ে যাব, অ বাবা?'

'না না, ছানি ঝপ করে কাটা চলে না, জানলে বুড়ী মা? ছানি পাকলে তবে কাটতে হয়।'

'হ্যাঁ বাবা, তকন হাসপাতালি ভর্তি করে নেবে তো?'

ডাক্তার ওকে হিউমার করেন, 'নোব বই কি!' আন্দি খুবই ব্যাকুল হয় ও বলে, 'তা হলি সকল অসুক সেরে ঝাবে গো বাবা!'

'কেন?'

'ওত খাওয়া দেবে নে?'

আন্দির নিদন্ত মুখের হাসিটি ডাক্তারের বুকে বেঁধে শূলের মতো। তিনি বলেন, 'এখন এস।' আন্দি ওঁকে আশীর্বাদ করে চলে যায়।

বাড়ি ফিরে ওর হাসপাতালের গল্প যেন ফুরোতে চায় না।

ডাক্তার কেমন বাতি ফেলে দেখল, কেমন ওষুধ দিল। কেমন ভরসা দিল!

ছোট ছেলে বলে, 'রূপকতার গপ্প হয়ে গেল ঝ্যামন?'

'ঝেয়ে দেহকে এলে?'

'গপ্প কতাই হলো রে!'

অসীম কৃতজ্ঞতায় আন্দি উঠোন থেকে মানকচু তুলে যখন হাটে পাঠায়, তখন ছোট একটা কচু এনায়েতকে দিয়ে আসে।

বড় বউ বলে, 'হাটে বেচলি নুন-তেলটা হতু? তার ঘরে কি মানকচু নি?'

আন্দি বলে, 'মান গাছ তো আমিই আজ্ঞ্যেছলাম। দিলি বা এট্টা

মানকচু ? ও নাল্লে কে বা তকন আমায় নেঁ ছানি কাটাবে বল ?'

আইড্রপ দিতে আন্দির নিজেরই বিভ্রম হয়। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বড়ি খেয়ে মনে হয়, দেহে বল পাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই ও জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁ নোদো, সেই ঝে দু-মাস। তা হত্তি কদ্দেরি রে ?'

'ঝকন হবার তকন হবে ঠাম্মা।'

'ই কি এট্টা জবাব হলো ?'

বড় বউ নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'মা, ও কি ঝানবে।'

সময় হলি আমি তোমারে নে যাওয়ার বেবস্তা করব। ও কি ঝানে ?

বড় বউয়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস আন্দির, অগাধ ভরসা।

বলে, 'তুই ঝকন বললি, তকন হবে।' তারপরই ঘুরে এসে বলে, 'এই পাকা তেলাকুচো কটা পুইড়ে দিবি ?'

'তাল্লে লঙ্কা দে চাট্টি ভাত খেতাম ?'

মেজ বউ বলে, 'এই ঝে খেলে ?'

'খেইচি ? কি লজ্জা মা ! মনে হচ্ছে কিচু খাই নি ? এক গাল মুড়ি দে তবে ?'

'এখন মুড়ি খাবে ?'

বড় বউ বিরক্ত হয়ে বলে, 'ওর কি কোন সোদবোদ আচে কাছু ? মেনির মেয়েতে-ওতে তপাৎ আচে কিচু ? কতা ঝত বাড়াবি, তত বাড়বে। দে চাট্টি মুড়ি। একনো দশ পালি চিঁড়ে কুটতে-ঝাড়তে বাকি।'

'অ বউ, চিঁড়ে দিবি ?'

'নস্করের নোক তাইলে আমারে ঢেঁকশেলে ফেলে কুটবে। বরাতের চিঁড়ে।'

'ঝত কুটিস, সব ?'

'সব।'

'কেন ? হোতা চিঁড়ে কোটে নে ?'

বড় বউ দুঃখে মাথা নাড়ে। শুধু কি আন্দি? ওর শাশুড়ী? বাড়ির সবাই ওর ওপর ভরসা রেখে চলে। সেইজন্যেই তো বড় বউ নস্কর-গিন্নির হাতে-পায়ে ধরে চিঁড়ে কোটার, মুড়ি ভাজার কাজ আনে। বদলে চাল আনে। তেকলনা ধানের চাল ওজনে ভারি, বাড়ে কম। তবুও চাল!

আন্দির চার ছেলেই নস্করের জমি চষে। ব্লকের গ্রামে-গ্রামে নস্করের জমি, নস্করের আত্মীয়। "সিলিং" শব্দটি গ্রামবাংলার জন্যে তৈরি। সরকারী প্রহসন। নস্করদের বেলা "সিলিং" শব্দটি প্রযোজ্য নয়। সর্বত্রই নস্করের জমি। চাষ করে অন্যরা। চাষ করে বলে তারা বর্গাদার নয়। যে বছর যেমন নস্করের সুবিধে, তেমন মজুরী দেয়। টাকায় এবং ধানে।

এটি বে-আইনী তাও বলার উপায় নেই। নস্করই মাছের ভেড়ি ও হিমঘরের মালিক। সে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাসপাতালগুলির অর্ডার সাপ্লায়ার। তার ওপর, বর্তমানে সে পঞ্চায়েত প্রধান। মোহনপুরে তার খুড়তুতো ভাই প্রাণনাথ তদীয় সম্পত্তির দেখাশোনা করে।

মোহনপুরে প্রাণনাথকে টপকে কারো কিছু করার জো নেই। আন্দি কিছু বোঝে না। কিন্তু আন্দির ছেলেরা বর্তমানে প্রাণনাথের ভাষণে নাজেহাল। প্রাণনাথ ওদের শাসাচ্ছে। 'বর্গাদার ইউনিয়নে ঝাবি না নন্দ। লাভ হবে নে।'

'না হলি গোবিন্দরা ছাড়বে নে।'

'লাভ হবে নে। গোবিন্দ ও দলের ছেলে। আমে-দুধে মিশে ঝাবে, আঁটি পড়ে থাকবে।'

ফলে বর্তমানে আন্দির ছেলেরা অত্যন্ত ফাঁপরে পড়েছে। অন্যত্র বর্গাদারদের প্রোটেকশন দিতে হেদো ও গোবিন্দ এক দলে। স্বক্ষেত্রে হেদো কোনো আইন মানতে রাজি নয়। গোবিন্দ স্বভাবে সাচ্চা ও মেজাজে দুর্বাশা। সে কোন রকম বাই-লেন বোঝে না। তার সাফ কথা, আন্দির ছেলেরা যদি হেদোর ভয়ে বর্গাদার ইউনিয়নে সামিল

না হয়, তাহলে তারাও হেদোর দলে এবং সরকারের সদুদ্দেশ্য অন্তর্ঘাতকারী।

আন্দির ছেলেদের পক্ষে গোবিন্দকে বুঝিয়ে ওঠা সম্ভব নয়, যে হেদো নস্করও গ্রামে গভর্নমেণ্ট। তার শস্যক্ষেত্র কোন এক মিলে-ঝুলে-গানে পক্ষরক্ষী প্রোগ্রাম মতে, সাপ না মেরে লাঠি না ভেঙে কর্ষিত হয়। হেদোর দেড়শো কর্ষণকারীর কেউই সে ব্যবস্থা ভেঙে চিরস্থায়ী উপবাস-বন্দোবস্তে মরতে রাজি নয়। গোবিন্দ এও বুঝবে না, উপবাস-ভীত কোমরভাঙা মানুষগুলির এই নিক্রিয়তা সাবোটাজ নয়, সাবোটাজ করার এলেম নেই এদের। সদুদ্দেশ্যপূর্ণ, উৎসর্গীকৃত দেশকর্মী গ্রামবাসীদের কি রকম বিপদে ফেলতে পারে, গোবিন্দ তার প্রমাণ।

গোবিন্দ কিছুদিন কলকাতায় উধাও হয়। ফলে তার কথা ভুলে থেকে আন্দির ছেলেরা নস্করের নাবাল জমিতে আউশ চষে।

কিছুকাল বাদে গোবিন্দ নবরূপে কম্যুনিটি স্বাস্থ্য কর্মীরূপে মোহনপুরে পুনরাবির্ভূত হয় জ্যোতির্ময় চেহারায়। গোবিন্দ চিরকালই রুক্ষ মেজাজী সৎ ছেলে। পার্টির প্রতি আনুগত্যে সৎ এবং নিজ গ্রাম-বেসত বিপক্ষীয়দের জ্যাঠা মরলে কাঁধ দেওয়াতেও অগ্রণী। বয়স ত্রিশ হয়েছে। আজীবন ব্রহ্মচর্য এবং পার্টির ব্যানারে জনগণ সেবা ও করবেই।

এর আগে যা যা করেছে, তাতে কেন যে লোকে উপকৃত হয়নি, তা ও বোঝে নি।

ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে ও প্রাইমারি স্কুলে পাঠাত। অভিভাবকদের ধমকে বলত, 'পড়তে লিকতে শিকলে ওদের অশেষ উপকার, তা জান? তোমাদের মতো গরুগাধা হয়ে রইলে কংগ্রেসকে ভোট দেবে।'

অভিভাবকরা বলত, 'এই গোমুখ্যু গরুগাধাতেই তো তোমাদের ভোট দিয়েচে। দেয়নি, এখন ভুলে যাচ্ছ?'

'তা দিয়েচ।'

'তা, ভোট তো নিলে। বাপ খুড়োর বয়সীদের গরুগাধাও বললে। তা দিন দিয়েচে ভগমান, বলচ। কিন্তু, কেরাচিনি কেন বা দিচ্চ না বলতো? আলো না জ্বালালে চলে? এই সাপের মুলুকে?'

'হবে, সব হবে।'

'কেরাচিনি আন। পারমিটের কেরাচিনিতে নস্কর যে ঘর ভরে ফেলল?'

গোবিন্দ তখনি হেদো নস্করের কাছে গেছে। তাকে অন্তর্ঘাতী, বন্ধু বেশে পার্টির শত্রু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মোরব্বা খাইয়ে কেরোসিন বের করেছে, মোহনপুরকে দিয়েছে। এত করে তবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিতে পেরেছে ও, এবং চিন্তা করতে গিয়ে বুকে দাগা পেয়েছে গোবিন্দ।

ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখলে ওদেরই ভাল। সে ভাল কাজ করাবার জন্যে কেরোসিন দিতে হলো? অধঃপতন, অধঃপতন। নিশ্চয় কংগ্রেসী কুশাসনের ফলে মানুষের এহেন নৈতিক অবনতি।

তারপরেও স্কুল ফাঁকা। ছাত্ররা বাপদের সঙ্গে মাঠের কাজ শিখছে। গরু-রাখালী করছে। বলতে গিয়ে গোবিন্দ অপমান হলো। এক বুড়ো বলল, 'মেলা খেঁকাস নি গোবিন্দ। নেকাপড়ার ফল ভাল কি মন্দ; তা তুই কি ঝানবি? এট্টা পাশও তো দিস নি।'

আরেক জন এমন আড়বুঝো, যে বলে বসল, 'এট্টা পাশ করলি তাতেই মানুষ আচ, গরিবের কতা ভাবতেচ। আমাদের প্রাণনাথ নস্কর দু-ছেলের বাপ হয়ে পেরথম পাশ ঝামন দিল, তেমন গরিবের পরে ডাণ্ডা ঘুইরে বেড়াচ্চে?'

'বটে? এবার কোরোচিন কে দেয়, দেকব।'

'তুমি দেবে।'

'কেন?'

'মোদের তরে। গরমেন দেচ্চে না? পারমিটের কেরাচিনি না

দেবে তো ভোট দিইচি কেন ?'

এই রকম সব মানুষ নিয়ে গোবিন্দকে কাজ করতে হয়।

তারপরেই বর্গাদারের ব্যাপারটা। গোবিন্দ বোঝাতে গেল, 'হেদো নস্কর তোমাদের ঠকাচ্চে। ও ঠিক ব্যবহার করচে না।'

'তা-লে তারে প্রধান করেচ কেন ?'

'তোমরা জোট বাঁধ।'

'জোট বাঁধতে বা ঝাব কেন ? গরমেন ঝানে নে' নস্কর লোক কেমন। বাদ দিতে হয়, গরমেন দিক ? গরমেন ঝারে জব্দ কত্তে পারে নে, তার সঙ্গে লড়াই দাঙ্গা করে মরব ?'

'আমি তো আছি।'

'তোমারে নস্কর মানে নে।'

'নস্কর নিয্যস মানবে।'

• 'বাপু! বুড়ো মানষির কতাটা শোন। তুমি হচ্চ পাট্টির ছেলে, তোমারে নস্কর চটাবে নে। তকনকার মতো মানবে। কিন্তুক...।'

'কি' বলই না। গলায় গয়ের রেকে কাশচ কেন ? ঝেড়ে কেশে ফেল দিকি।'

যে কথা বলে, সে বুড়ো মানুষ। পিঁচুটি-পড়া হলদেটে চোখ তুলে, চোখে অসীম করুণা মেখে সে বলে, 'বারো বচরে বর্গাদারের স্বত্ব জন্মায়। নস্কর তোমার পাট্টিতে ছিল নে, একন সাবুদ হয়েচে। ওরে তুমিও ঝানো। নস্কর, এগারো বচরে নতুন সইটিপ নে চাষ কত্তে ডাকে। ও ঝে পাট্টিতে ঝাক, ও ককনো বর্গাদার স্বত্ব মানে ? ককনো এ্যাত ধান দেয় ? কিচু হবে নে বাবা, উলু খ্যাড়ের পরাণ ঝাবে।'

'এ তো হতে পারে না।'

'হয়েচে, হয়ে আসচে, হতেচে, হবে, তবু বল হতে পারে নে। ঝা দেকতেচ তা বোঝ নে কেন বা ? নস্করের সঙ্গে দেহাম বাদলে ও পাট্টি মানবে নে গোবিন্দ। ও কতা থাক।'

'এ তো অন্যায় কতা !'

'গোবিন্দ। যে হলে ছেলের বাপ হতু। নস্করের তোমরা ঝকন সমুকে এনেচ, ওপরে তুলেচ, তকন ঝানতে নে ও কি দরের নোক? ও কোনদিন দশঝনের কতা ভেবেচে ঝে আজ ভাববে? তকন নকসালী সময়ে ঘাবড়ে ঝেয়ে পালাল, তাতেই বলল, আমি পার্টির সোদর বলে নকসালরা তাসাতেচে—তাতেই আগের সরকারও দুদের বাটি ধরে দিচল, তোমরাও তাই দিলে। একন হটাৎ ও দশ ঝনার কতা ভেবে ভাল হবে ভাবচ কেন? সে ঝাক। নস্কর ঝ্যামন আচে থাকুক। আমাদের ছুকো ঝাবার নয়। আশপাশে দশঝনা স্বত্ব পাচ্চে, ভাগ পাবে, দেকে ঝাব আমরা।'

গোবিন্দ, বৃদ্ধের কথাগুলির যাথার্থ্য বোঝে। ক্ষণিক অস্পষ্ট বোঝে, ওর সততা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কেন যেন হেদো নস্কর এখনো সরকারের কাছে প্রয়োজনীয়। বলে, 'কি ঝানি? কোতা কি ঠিক হয়, আমরা ঝানতেও পারি না। ঝা হোক, আমি দেকি তোমরা কেরোচিন ঝাতে পাও।'

ইত্যকার প্রতিশ্রুতি দেয় গোবিন্দ। তারপর আর আন্দির ছেলেদের বর্গাদারী আন্দোলনে ঝাঁপ দিতে বলে না।

কিছুদিন মনে নানা প্রশ্ন জাগে ওর। তারপর জানতে পারে ও কম্যুনিটি হেলথ ওয়ার্কার-রূপে নির্বাচিত হয়েছে। ওকে কেন? ও গ্রাম ছেড়ে গেলে গ্রাম চলবে? গ্রামের মানুষগুলি গোবিন্দর শরীর ও মনের সিসটেমে ঢুকে গেছে।

গ্রামের লোকদের ও বলে, 'ডায়মন-হারবার যাচ্চি। তারপর কলকেতা যাব।'

'কেন?'

'সদাসব্বদা ছুটতে পার হাসপাতালে?'

'না।'

'চিকিচ্ছের গোড়ার কতা শিকতে যাচ্চি।'

'শিকে? ডাগ্‌দার হবে?'

'এই নইলে ভেমো চাষা? বলি ডাগদার হওয়া সোজা? কত নেকাপড়া শিকতে নাগে? কত বচর পড়তে হয়? কত হাজার টাকা নাগে? তা বাদে ডাগদারখানা সাইজে দিতে টাকা নাগে।'

'সে তো নাগেই।'

'আমারে তোমরা জন্মভোর দেকচ। মধু কৈবতের ছেলে গোবিন্দ আমি? বাপ বর্গাদার। ছেলে সেই দেকে নেকাপড়া শিকল. না। আমারে কেউ বিশ হাজার টাকা খর্চ কইরে ডাগ্‌দার বাইনে আসবে? না আমার সেই ক্ষ্যামতা আচে? আমার বাপ ইসকুলি ঠেলতু, আমি মাঠে ঝেতু।'

'সে তো ঝানে।'

গোবিন্দর মনে কোন পুরনো ব্যথা জাগে। সে বলে, 'এককালে আমিও নস্করের গরু তাইড়িচি। বাপের পয়সা ছিলনে, ইসকুলি ঝাইনি। কিন্তুক গরুর পিঠে চেপে বাড়ি ফিরতি-ফিরতি সপন অনেক দেকতু। সপনে ডাগদার হতু। ইঞ্জিনির হতু। টেনের ডাইভার হতু। ককনো বা নস্কর হতু।'

'ওই শেষে ঝেটি বললে। সেটি ভাল সপন দেকনি। তুটো নস্কর হলি আমরা মরতু।'

'তা বাদে ঝকন হতে দেশের কাজ কত্তেচি, পাট্টির কাজ কত্তেচি, তকন হতে আর মনে কষ্টনি। না খুড়ো, ডাগদার হতে যাচ্চি নে। টীকে দেব, কলেরার ইঞ্জিশান। অল্পসল্প ঝকম হলে, কাটল-ছিঁড়ল-পুড়ল, তা দেকব। রুগীরে হাসপাতাল নেব। এই সব শিকতে যাচ্চি। তোমাদের ঝন্যে ভাবনা ঝত। আমি থাকতে তোমাদের দুদ্দশার অন্ত নি। গেলে বা কি করবে। সেই ভাবতেচি।'

গ্রামের লোকগুলি ওর কথার পেছনের আন্তরিকতা বোঝে। গ্রামকর্মী গোবিন্দই ওদের ও সরকার নামক বিদেহী ও গ্রামজীবনে চির-অনুপস্থিত অস্তিত্বের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা।

সে আন্তরিকতা বোঝার পরেও, গোবিন্দ কোনদিন ওদের ইঞ্জেকশন ও টীকা দেবে, ভাবলেও ওরা ভয় পায়। গোবিন্দ তো! হয়ত চেপে ধরে ঘরের খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে-ছেঁদেই ছুঁচ ফোটাবে।

নিশ্বাস ফেলে অধর কৈবর্ত বলে, 'একেবারে অদেকা হয়োনি গোবিন্দ। তাল্লে গম-কেরাচিন মোটে পাব নে।'

'না না, সে আমি আসব বই কি।'

গোবিন্দ তার কথা রাখে। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে সে মাসে টাকা পঞ্চাশ কনটিনজেনসি ভাতা পাবে। এ কথা শুনেই তার মা বলে, 'তবে মেয়ে দেকি?'

'অ গোবিন্দ!'

'কেন? মেয়ে বা দেকবে কেন?'

'ডাগদার হবি, পঞ্চাশ টাকার চাগরি হতেচে, সোমসার করে দিই?'

'সোমসার! ঘরে-উটোনে হাঁসের বাচ্চার মতো একপাল বাচ্চা প্যাঁক প্যাঁক না কল্লে ভাল লাগচে না বুজি। দেক মা। আমি একন তোমার একার ছেলে নই।'

'আমি পাট্টির কর্মী, দশ ঝনার।'

'দশ ঝনা তোর কাঁদে হাগবে, বুজলি? বলি, দশ জনার পেটে হইচিস্ না আমার পেটে?'

'পাট্টি করে জ্ঞানগম্মি গেচে?'

'পাট্টির নামে কতা?'

বলে গোবিন্দ পবিত্র ক্রোধে পন্তিভাতের সানকি আছড়ে ফেলে বসার পুরশি পিঁড়ি আছড়ে ভাঙে ও বেরিয়ে যায়।

মা গোবিন্দর ছোট ভাইয়ের বউকে শাশ্রুচোখে বলে।

'পাট্টি কি জিনিস মা? আমার গোবিন্দ রাগ-ঝাল মোটে ঝানে নে একন? আগে হলি বাঁশ পিটিয়ে উন্নুন ভেঙে দিতু?'

'সত্যি?'

'সোয়ামিরে শুদিও। কত ভেঙেচে মেটে হাঁড়ি কত ভাঙতু

উনুন বা ভত। ই পাট্টির গুণ মা। নইলি ছেলের ম্যাজাক চড়া বলে মাদুলি দিইচি, চণ্ডী থানের জলে নাইয়েচি, ম্যাজাক কমে নে?'

ছোটবউ একটু নিরাশ হয়। তার পিসতুত বোনকে ভাসুরের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে তার ছিল।

এরপর গোবিন্দ গ্রাম থেকে প্রশিক্ষণে যায়। নস্কর তার নিজ লোকজনকে বলে, 'ছোঁড়া যৎদিন সরে থাকবে, ততই ভাল। ভারি হেঁপো ছোঁড়া। খালি ঝানে মানুষরে খুঁইচে ঘা কত্তে। কেরাচিনি রে, গম রে। কেরাচিনি মজুদে রইলি তবে তোরা বিপদে পাস। কেরাচিনি কি চেরকাল ছিল, না পেতু?'

'তা বোজে কে?'

'এ আমলে সকলার ম্যাজাক গরম। গোবিন্দ বলে, গম দাও। চেরকাল কি গম জানতু, না রুটি খেতু?'

'যত্ত সব!'

'তা শোনে কে?'

এ ভাবে যারা নস্করের সঙ্গে জল-উঁচু জল-নিচু করে, তারাই গোবিন্দ গ্রামে এলে খবরটি দেয়। গোবিন্দ বলে, 'হেতা ক্যানো? সেতা ঝেয়ে মোসায়েবি কর না?'

গোবিন্দর মনে এখন যে সব কথা আসে, সেগুলো তার নিজস্ব। পার্টি অনুমোদিত নয়। বর্গাদারের ছেলে ও গ্রামের ছেলের মানসিক প্রতিক্রিয়া।

সে নস্করের ওখানে চলে যায়। বলে, 'এই যে কাকা। পারমিটের কেরোসিন আর রেশনের গমের সময় হলো, চলে এলাম।'

'আমি কি দিতাম না, না তুমি আমারে বিশ্বাস পাও না, অ্যাঁ? আপনা আপনির মত্তি অবিশ্বাস ঢুকে গেলি গোবিন্দ, সব্বনাশ হয়।'

'আপনি আচেন বলেই তো ভরসা।'

'মোহনপুরের আল্দির ব্যাটারা সেথো কেন? তোমাদের কৈবত্ত পাড়ার চাঁদ, হরেন, শশধরেরেও দেখতে পাচ্চি।'

'ওদেরওকে শিক্যে দিচ্চি দাঁতন ঘোঁতন। বুঝলেন কাকা? আমি একন স্বাস্থ্যকর্মী হচ্চি তো। আপনারে সাহায্য কত্তে পারবুনি সদাসব্বদা। এরা রইল। আপনি একা বা কত দিকে ঝাবেন! একন সরকারের ঝা নিয়ম। দশঝনারে নে কাজ কত্তে হবে।'

'তা ঝা বলেচ।'

নস্কর কিল খেয়ে হজম করে। মনে মনে ঠিক করে, গোবিন্দকে প্রথম সুযোগেই হজিমত দিতে হচ্ছে। মুখে বলে, 'ঝা বল কত্তেচি। তোমরা হোচ্চো গে ঝারে বলচে যুবো শক্তি। সায়েবী আমলে ঝারা মড়া পোড়াত, আগুন নেবাত, তাদের বলতাম ভলানটের। ভোগের চ্যান হচ্চে বেউলো নদীতে, তা ছিরে মালের পিসি ডুবে ঝায়, তা ভলান্‌টের ছেল না বলে ডুবে গেল?'

'অন্যরা সাঁতরাল না কেন?'

'পরের কাজ ঝে ভলানটেররা করতু।'

'একন তা কল্লে চলবে নে কাকা। ঝে ঝা ঝানে সব নে এগুতে হচ্চে।'

কথাগুলি নিমপাতার মতো নস্করের কাছে। গোবিন্দ বলে, 'আমারে ত শুদু মোহনপুরের কতা ভাবলে হবে নে। বেউলো হতেও ছেলেনেদকে নোব। এরা নোকদের নেসবে, কার্ড দেকবে, জিনিস দেবে।'

'বলচো ঝকন।'

'বলতাম কি আর? মানষি ঝদি জিনিস পেতু তাইলে কি আর বলতু? বলতে হচ্চে এটাই দুকের কতা, বুঝলেন কাকা?'

বলতে বলতে গোবিন্দর মুখ লাল হয়, কপালের শিরা ফোলে এবং নস্করের মনে পড়ে গোবিন্দর প্রবাদবাক্য সদৃশ মেজাজের কথা। সে অতীব মোলায়েম গলায় বলে, 'বাবা! বয়স হচ্চে, তাতে মাতায় হাজার কাজের ভার। ভুলচুক কি হয় নে? খ্যামাঘেন্না করে নাও। আমিই কি সব ঝানি? তোমরাও ঝানাবে আমারে।'

এ কথা শুনে আন্দির ছেলে নন্দ হঠাৎ হেসে ফেলে। নস্কর সেটি দেখে। ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, 'ভাল মনে কতা কইলাম, হাসাল নন্দ? তা হাসবি, ভগবান দিন দেচে ঝকন, তখন ব্যাঙের নাত্তি খাব কেউ, কে বা নাত্তি মারবে।'

গোবিন্দ বলে, 'যাক হেসে ফেলেচে, দোষ করেচে, তবে আপনি নাত্তি খান নি, নন্দও মারে নি, একন। কাল সকালা গম কেরোসিন বিলি হবে। এবারটা আমি দাঁইড়ে বিলি করাব।'

'ঝা বল।'

বেরিয়ে এসে গোবিন্দ বলে, 'ছিরে মাল নয়? অ ছিরে কাকা, কোতা যাচ্চ?'

'তোমার কাচে। তুমি এখন ডুমুরের ফুল হয়েচো। দেকা মেলে নে।'

'বেউলো গেরামে তিন ঘণ্টা এইচি। তুমি কোতা ছিলে?'

'আর কোতা! শুনলাম, নস্করের না কি কেঁৎকা বেইড়ে কেরাচিনি আর গম বের কোরোচো?'

'না না, পারমিটের মাল দোবার ব্যবস্তা করলাম। কেঁৎকা বেড়াব কেন?'

শ্রীপদ মাল বেহুলা গ্রামের বাইরেও বিখ্যাত সর্পদংশন চিকিৎসক। সে সাপের ওঝাও বটে এবং বাইরেও সে স্ব-পেশায় উৎসর্গীকৃত এক সত্তা। তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। চিকিৎসা বিদ্যার সীমা সে জানে ও রোগীদের হাসপাতালে নেয়। হাতপাতালে স্নেক ভেনমঅ্যান্টিসেরাম না থাকার বিরুদ্ধে শ্রীপদ বহুকাল লড়ে যাচ্ছে। তার ব্যক্তিত্ব এমনই যে মাল হয়ে সে ডাক্তারী চিকিৎসার দ্বারস্থ হচ্ছে দেখেও মানুষ তাকে তবু শ্রদ্ধা করে। শ্রীপদর মুখে-চোখে সাধারণত থাকে শান্ত পরাজয়। ও জানে, সাপে-কাটা রোগী বাঁচাবার ব্যাপারে ও হেরে গেছে। পরাজয়টা ও স্বীকার করে নিয়েছে।

এখন ওর মুখেচোখে স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভাব নেই। রাগ। ও বলে, 'শালা মহাপাপী।'

'কি হলো?'

'ওই, ওই শোন। কান্না শুনচ?'

গোবিন্দ কান পাতে। চেনা কান্না। সসাগরা গ্রামীণ ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত। মৃতদেহ সামনে নিয়ে মেয়েছেলের কান্না। ভারতের সংবিধান স্বীকৃত সকল ভাষায়, সকল আদিবাসী ও উপজাতি কথা-ভাষায় এই বিলাপ শোনা যায়। এ সময়ের কান্নায় সাধারণতঃ কথায় বিন্যাস থাকে, ও কান্নাটি অদূরে বলে গোবিন্দ শুনতে পায়।

'কচুর নতি আদতে বলে গেলে ঝে? কচুর নতি এঁদেচি গো।'

'কে গেল?'

'মোতাহের। তাতেই বেউলোর কেউ ঝায় নে তোমার সঙ্গে।'

'আশ্চাজ্জ, কেউ বলে নে তো?'

'বলে বা কি করবে? হাসপাতালে ইঞ্জিশান থাকে? সোমসার ভাইসে চলে গেল।'

'ককন কেটেছিল?'

'সকালা। ওই নস্করের ঝন্তি। শুঁয়োর বেটা এক ইটের পাঁজা বাইনে সাপে গেরামে বান ডাইকে দিল। মানুষির কাজ করবে গোবিন্দ যদি ওই নস্করের দে পাঁজা ভাঙতি পার।'

গোবিন্দ স-দুঃখে হাসে। বলে, 'ছিরে কাকা! মধু কৈবর্তের ছেলে পাট্টি কত্তে পারে, তোমাদের জন্যি জান দিতে পারে। নস্করের দে পাঁজা ভাঙাতি পারে না। বলবে, সে ওর নিজের ব্যাপার।'

'হাসপাতালে ইঞ্জিশান আনতে পার?'

'কাকা, যখন ইঞ্জিশান পাও, সে এই গোবিন্দের তদ্বিরেই আসে।'

'তাতে কি সম্বচ্ছর মানুষ বাঁচে? শালারে এট্টা সাপ কাটে নে?'

শ্রীপদ মাথা ঝেঁকে চলে যায়। গোবিন্দের মনে নস্করের বিরুদ্ধে নতুন রাগ জমে। ফলে সে পরদিন এসে বেহুলা ও মোহনপুরের

সকলকে গম ও কেরোসিন দেয় ঠিক ওজনে ও মাপে। নস্করকে শুনিয়ে বলে, 'আসচে তারিকে ঠিক এই মাপে, এই ওজনে নেবে। মাল থাকবে। না পেলে বলবে ব্যবস্তা হবে।'

তারপর গোবিন্দ চলে যায়। যাবার সময়ে শ্রীপদ বলে দেয়, 'কলেরা মাজেমদ্ধ্যে হয়। সাপের ইন্জিশানটা শিকে এস দিকি?'

'সেকায় তো শিকব। তোমরা, ঝারা মাতব্বর আচ, পারমিটের দিনে মাপে-ওজনে কেরোচিন গম নেবে।'

'দেবে?'

'ভেমো চাষার মতো কতা কোয়ো না কাকা। হকের জিনিস, সরকার দিচ্চে।'

'নস্কর বসিয়ে রেকে বুড়ো মানুষরে গাল পাড়া ঠিক হয় নে গোবিন্দ।'

'গাল দে থাকি তো জুতো মার। কিন্তু মাপে-ওজনে জিনিস নিও। না দিলে দেকাব ওরে।'

'সেই তো বলি! সরকার দেচ্চে, তোমার হাত দে দেচ্চে। সে মাল বের কত্তে গোবিন্দরে দরকার। ই কি আবুস্তা বল দিকি?'

'কি করবে বল? এই করেচে, এই ভাবে চাইলেচে, এত্তেই অব্যেষ হয়েচে। অব্যেষ পালটাতে হচ্চে তাতে কোঁক ফাটচে।'

'সকল রাজত্বেই নস্কর ঠিক রাজত্বি করে বেইরে গেল দেকলাম।'

'আজ গেল, কাল ঝাবে?'

'ও কতা বোল না গোবিন্দ। ও কতা আমলে-আমলে কৎঝনা বলল। কি চুকত্তে পাল্ল কি?'

'দেকাই ঝাক।'

গোবিন্দ এরপরে প্রশিক্ষণ নিতে যায়। মাঝে-মাঝেই নিজের বিচরণ-ক্ষেত্র সরেজমিন তদন্ত করে যায়। নস্করকে ঠিকপথে রাখা চারটিখানি কাজ নয়। গ্রামের মানুষগুলিকে মদত দিয়ে যায় গোবিন্দ। কিন্তু প্রশিক্ষণের সময়কাল শেষ হলে গোবিন্দ অপরাপর

স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে ইন্‌টেন্‌সিভ ট্রেনিং-এ যায় পনের দিনের পর।

তারপরেই সে জ্যোতির্ময় চেহারায় মোহনপুরে ফিরে আসে নবার্জিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে। পোড়া-কাটা-জলেডোবার প্রাথমিক চিকিৎসা শিখেছে ও। কলেরার ইঞ্জেকশন ও বসন্তের টীকা দিতে শিখেছে। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ বিচার করতে শিখেছে।

এসেই ও মোহনপুরে চক্কর মারে এবং আন্দির বাড়ির ভিতর হাঁক পাড়ে। 'অ আন্দি পিসি! কিসের মোহনপুরের গল্প কর? তোমাদের গোবিন্দ যে ডাগদারী শিকে এল গো!'

দাওয়ায় বসে থাকা পুটলিটি যে আন্দি, তা বুঝতে ওর সময় যায়: ও বোঝে যখন, বেজায় শক খায়, ধাকা খায় মনে। শকের চিকিৎসাও শিখেছে ও কিন্তু সব শকের চিকিৎসা হয় না। ডুমুর-কুড়োনো, থানকুনি-তোলা, দূর্বো-তোলা কোমরবেঁকা আন্দি পিসিকে জবুথবু পুঁটলি সদৃশ্য দেখে যে শক খায় গোবিন্দ, নিজেই বোঝে, সাল-ভোলেটাইল বা অত্যধিক চিনিযুক্ত জলে তা সামলান সম্ভব নয়।

'কি হলো, পিসি?'

গোবিন্দর যেমন স্বভাব, স্বতই ওর মনে হয়, ও ছিল না বলেই আন্দির এ হাল হয়েছে। এবং নিজেকেই দোষী মনে হয় ওর।

'আর গোবিন্দ! ভাল বুজে ঝা কত্তে গেলাম, তাতে মন্দ হয়ে পড়ল বাবা। আমার চোক,'...আন্দি হা হা করে কেঁদে ওঠে এবং গোবিন্দ দেখে যে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, সে চোখ দুটি রক্তাক্ত ও ঘোলাটে। মণি, শ্বেতাংশ কিছুই আলাদা করে চেনার উপায় নেই। সব চেয়ে ভয়ানক হলো, চোখ দুটিতে যেন রক্তাক্ত এক বিভ্রান্ত ক্রোধ।

'কি হলো?'

বড় বউ এগিয়ে আসে গোবরমাখা হাতে। শাশুড়িকে ধমকে বলে, 'কাঁদতে বারণ করেচে না ডাগতার? কাঁদবে না মোটে।'

'কাঁদব না? চক্ষু চলে গেল কাঁদব না?'

'কাঁদবে না। এই তো গোবিন্দ এয়েছে, সকল ব্যবস্থা করবে।'

'কাঁদব না?'

'না। বললাম যে হাতের আন্দাজে সুতোর ফেত্তা পাকিয়ে দাও?'

'আমি পারি না রে।'

'পারবে। কে বলচে তুমি কাজের বার হোয়েচো? তাল্লে গোবর ঘেঁষে গুলগুলো দিচ্ছে কে?'

বড় বউয়ের কথায় যেন জাদুর কাজ হয়। আন্দি চোখ মোছে ও সুতোর ফেত্তা ফেরাতে থাকে। ওর চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। গোবিন্দ সেদিকে চায়, গভীর অস্বস্তিতে বড়বউ শুকন গলায় বলে, 'একন কাঁদতেচে না। একবার কাঁদলি চোক দে জল পড়ে।'

'কি হলো পদ্ম বউ?'

বড়বউ গোবর চাপড়া দিতে-দিতে বলে, 'তকন বুজি হাসপাতালে বলিছিল চক্ষু কাটাবার তাঁবু পড়বে। পড়িছিল। এনায়েৎ খবর দিচল। ঠাকুরপো আর নোদো নে গেল। তারা দেকে বলল, এ ছানি নয়। মায়ের চোকের শিরা ছিঁড়ে গেচে। বুড়ো মানুষ না হলি চক্ষু কাটা চলতু। তারা ওষুদ দিল চোকে দিতি। বলল, ওই ছেমা ছেমা দিষ্টি জনম ভোর থাকবে। ওর জেবন কেটে ঝাবে। মা খুব ব্যাগাতা কত্তি তারা বলল, অস্তর কল্লে ওটুকু দিষ্টিও থাকবে নি।'

'এমনটা হলো কি করে?'

বড়বউ নিশ্বাস ফেলল। বলল—'বাতাসী মারে বোঝাল যাবুদপুরে হাটে না কি কে আসে। সবার চক্কুর সাত্তেচে, চশমা দিত্তেচে। সেতা ঝাবে বলতে বড় ছেলে বেড়ে উঠল। বলল, হাসপাতালের ডাগদার পারল নে, সে সারাবে চোক? কানা হয়ে ঝাবে। এমন কাজও কর না।'

'তারপর।'

বাতাসীর সাতে শলা কবে সেতা গেচে। বাড়িতি কারুকে বলে

নে, কেউ ঝানে নে। নারকোলের গাচ ছাড়াছে প্রাণ নস্কর, চাট্টি বাগাল আনি গে বলে বেইরেচে। আমিও ঝানি নি কিচু। পাঁচ পালি মুড়ি ভাজব। সগলার ভাতজল, মা অমনি চলে গেচে। সেতা ঝেতে সে নোক ছুটো টাকা নেচে। আর কি ওষুদ ঝে দিল, সে চক্কে দিতি মা "লঙ্কাবাটা জ্বলুনি রে, লঙ্কাবাটা জ্বলুনি রে", বলতি-বলতি কাটা পাঁটার মতো আচাড় খেতি নেগেচে। বাতাসী তা দেকে ভয়ে ওনারে পাঁজকোল করে নে, ছুটে-ছুটে এয়েচে, ঝানলে ?'

'তারপর ?'

'চক্কু ধোয়াই, কবরেজ বাড়ি হতে পদ্মমধু এনে দিই, সেতা তো কোবরেজী একন কেউ করে নে কত্তা মত্তে, তা গিন্নি মা এট্টু দিল। তাই দিই। পদ্মপাতায় চক্কু ঢেকে, ডুব দে পুকুরির তলের পাঁক এনে পাতার ওপর দিই, তবে এট্টু ঠাণ্ডা হলো। পরদিন গরুর গাড়ি চেয়ে এনে নস্করদের হাসপাতালে নে ঝাওয়া হলো। চক্কু ফুলে ঢোল, খুলতে পারে নে, ডাগদার বলল। সে ওষুদে মণি গলে গেচে আর কি ? হবার নয়। মলম দেচে। বলেচে হেতা হবে নে। তামলীতে ভাল ডাগদার। ঝদি কিচু কত্তে পারে। হেতা কিচু হবে নে।'

'সে লোকটাকে ধত্তে পারে নি ?'

'ঠাকুরপো তো দু-হাট যাবুদপুরে গেল। কিছু খোঁজ মেলে নে।'

'এই সব একন তোমার পরে ?'

'কি করব ? ফেলে দোব ? পাঁচ বচুরে মেয়ে এনিছিল আমায় মোয়া দে মুড়কি দে ভুইলে রাকত। ওই পাঁচ ঝনার কতায় নাচা স্বভাব। বাতাসীর কতায় হাটে ঝেয়ে...'

গোবিন্দ বলে, 'দাঁড়াও দেকচি। এই থুড়বুড়ে মানুষ নে তামলী ঝাবে কে ?'

'হেতা হয় নে ঝে ?'

'দেকা ঝাক। নন্দরে পাট্যে দিও আমার কাচে।'

গোবিন্দ নন্দকে বলে, 'একন নিয়ম ঝেনিচি। ইনি না পারে,

ডাগদার ডাকতে পারে সদর হতে। তাই করুক?'

'পিসিরে তামলী নে ঝাওয়া যাবে নে।'

'তুমি বললি শুনবে?'

'দেকি।'

ডাক্তার গোবিন্দর কথা অসীম ধৈর্যভরে শোনেন। তারপর বলেন, 'ওর কি হয়েছে জান?'

'ঝানলে ডাক্তার হতু।'

'বহুমূত্র জানলে? অপারেশন করা কঠিন। তাতেই চোখে ঘা ধরেছে।'

আপনি সদর হতে ডাগদার ডাকান। আপনাদের তো নিয়ম আচে।'

'তুমি সত্যিই ওর চিকিৎসা করাবে?'

'মশকরা করচি না কি?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর বলেন, 'নিয়মমতে আমি ডাক্তার চাইতে পারি। সদরের ডাক্তার আসবে না কি ঠিক নেই। আগে-আগে দু'বার চেয়েছি আসে নি। তামলীর হাসপাতাল ভাল। ডাক্তার সরকার ভাল ডাক্তার। রবিবার ওঁকে নিয়ে এস। চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

'সদরের ডাক্তার আসবে না কেন?'

'নস্করবাবু জানেন।'

'হেদো নস্কর?'

ডাক্তার শুকনো গলায় গভীর হতাশায় বলেন, 'টেন্‌ডার ওঁর। দুধ বলতে জল, ডিম বলতে পচা, মাছ বলতে চেদাকাপড়া, চাল গুদোম ঝেঁটোন, বলেছিলাম বলে উনি আমার নামে সদরে যথেষ্ট বলেছেন। আমি কদ্দিন থাকব তাও জানি না। অন্য ডাক্তার আনার চেষ্টা করছেন।'

'আপনি চেয়ে পাঠান ডাক্তার।'

গোবিন্দ সরাসরি যায় হেদো নস্করের কাছে। বলে, 'হাসপাতাল

যাতে ভাল চলে সে দেকাও আমার কাজের মধ্যে পড়ে।'

'ও ডাক্তার থাকতি ভাল চলবে নে।'

'ডাক্তার মন্দ! বেশ, আপনি তো ভাল। তাল্লে হাসপাতালে যত পচা-পেঁকো মাল দিচ্চন কেন?'

'সরকারী রেট ঝান?'

'আমি ঝানি। সরকারী রেট কি তা ঝেনেই তো আপনি কণ্টাক্ট নিয়েচেন। একই রেটে তামলী হাসপাতালে ভাল মাল যাচ্চে কি করে? সেতা অন্য লোক দিচ্চে। সাধন দত্ত হেতা দিচ্চে না কেন? আপনি আচেন জেনে কেউ তো টেণ্ডার নেয়ই নি।'

'কি বলচো গোবিন্দ? ভাল বুজে কাজটা নিলাম। ভাগদারের কতা শুনে আমারে তাসাচ্চ?'

'তাসাব নি। মাল ভাল দেবেন কাকা। আব ভাগদারের নামে চুগলি খাবেন না। লোকটা বিশ ঘণ্টা খাটে। ওকে সরাতে যাবেন না।'

'তাসাচ্চ গোবিন্দ!'

'সদরে আমারও চেনা আচে। এট্টা ভাল ওষুধ এলে আপনারে দিতে হবে। ওষুদ কোম্পানীর লোক যা দে যাবে, আপনি নে আসবেন, ঐ কি কারবার? সব্বদা লাভ দেকলে হয়?'

'আহা হা, আমি তো সব দেকতে যাই না। কে কি দিচ্চে, শোন দেকচি আমি।'

গোবিন্দর তড়পানিতে সাময়িক কাজ হয় ও হাসপাতালে খাবার কাঁচা মাল সামান্য স্বাভাবিক হয়।

কিন্তু সদরের ডাক্তার আসে না।

এবার গোবিন্দ সদরে যায়। যাদের-যাদের মারফতে গেলে চোখের ডাক্তার কথা শুনবে, তাদেরই ধরে। ফলে ডাক্তার আড়ালে বলেন, 'রাজনীতির লোকেরা চাপ দিচ্ছে।' সামনে গোবিন্দকে বলেন, 'শনিবার যাব।'

'কখন ?'

'ন-টা-বত্রিশের ট্রেনে।'

গোবিন্দ মনে করে একটা বড় লড়াই জিতল। গ্রামে ফিরে সে হাসপাতালে ডাক্তারকে খবরটা দেয়।

ডাক্তার বলেন, 'আর দশটা চোখের পেসেন্ট জুটিও না ভাই। বুড়ীর কেসটাই হোক।'

'তারে আনব সেদিনই।'

এবার আন্দি বুড়ীর হাসপাতালে আসা নতুন পন্থায় হয়। নন্দ কাঁধে বাঁক বয়। একদিকে কয়েকটি বস্তা ও অন্যদিকে মাকে বসায়। গোবিন্দ নস্কর পাশে হাঁটে ও মাঝে-মধ্যে বাঁক কাঁধে নেয়।

হাসপাতালে পৌঁছে চট পেতে ওরা আন্দিকে একটি বকুলগাছের নিচে শুইয়ে দেয়। ডাক্তার একবার আসেন ও লোশনসিক্ত তুলো দিয়ে আন্দির চোখের পুঁজপিঁচুটি মুছিয়ে দেন। গোবিন্দ ও নন্দ অপেক্ষা করে।

বেলা বাড়ে। ডাক্তার আসেন না। গোবিন্দ বুঝে পায় না কি হলো। স্টেশনে খবর নিতে যায়। স্টেশন মাস্টার বলেন, 'কেন ? ডাক্তার তো এয়েচে ? সেই গলায় আবওলা বেঁটে ডাক্তার তো।'

'হ্যাঁ। এয়েছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। নস্করবাবুর চাকর তারে নিয়ে গেল। ছিপ এনেচে দেখলাম।'

'ছিপ !'

'হ্যাঁ। উনি তো মাঝে-মদ্যে আসেন। মাচ ধরেন পুকুরে। আমারও মাচের নেশা। তাতেই দেকেচি। এয়েছে।'

'ন'-টা-বত্রিশে ?'

'সাতটা তেতাল্লিশে।'

গোবিন্দের মাথার মধ্যে হাজার লক্ষ কিলো সাইক্লে ঝড় ওঠে। ও বলে, 'সাইকেলটা দিন একটু।'

সাইকেলে চেপে ও হেদো নস্করের বাড়ি ছোটে। নস্করের চাকর বলে 'তানারা বিলে মাচ ধত্তেচে। এই তো আমি বাবুদের খাইয়ে এলাম।'

গোবিন্দ চলে যায় বিলের ধারে। দেড় মাইল দূরে। গাছের ছায়ায় হেদো নস্কর ও ডাক্তার ছিপ ফেলে বসে আছেন। চারদিকে শান্ত ও সুন্দর প্রকৃতি। বাবুদের অসুবিধে ঘটাবার ভয়ে দূরে আঘাটায় একটা ছেলে মোষ স্নান করাচ্ছে। শালুক ফুলের ওপর উড়ে-উড়ে পড়ে ও ওঠে জলপিপি পাখি।

'ছিপ রাখুন। হাসপাতালে চলুন।'

গোবিন্দ এত চেঁচিয়ে কথা বলে যে দুজনেই চমকে ওঠেন। হেদো নস্কর বলে, 'যাবে যাবে! এট্টু মাচ ধরে...'

'ধরাচ্ছি মাচ। শালা আগের আমলে যা কত্ত, তাই কল্লে বজ্জাতি ঘোচে। রুগী মত্তেচে, ডাক্তার হেদোচ্ছে, ইনি মাচ ধরচেন। তারা ধরত আর প্যাঁদাত, ঠিক করত। তা কল্লে ঠিক হয়।'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি।'

'এখুনি উঠুন। সাইকেলে চাইপে নে যাব। বেঁদে রেখে দোব গাচের সঙ্গে। হয় সদরে বসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করব. নয় কলে এসে মাচ ধরব। মাতা কিনে রেখেচে।'

'শোন গোবিন্দ...'

'থামুন আপনি। আপনাকেও সহজে ছাড়ব কাকা! বড্ড ভুল কল্লেন। রাগলে, আমি রাগলে গাঁ-গেরামে হাংনামা তুলে দোব। পাট্টি-ফাট্টি মানব না। আপনারও বোজার সময় এয়েচে।'

ভীত ও সন্ত্রস্ত ডাক্তারকে সাইকেলের সামনে নিয়ে আসে গোবিন্দ। হাসপাতালের ডাক্তারকে বলে, এনার এস্তেকাল ফর-মিয়েচে ডাগদারীর। এ রকম কত্ত বলেই সোনা ডাক্তারের লাশ পড়িছিল লাইনে। শয়তানের জাসু। এয়েচে কঠিন রুগী দেকতে, নস্করের সঙ্গে ঢলিয়ে ঢলিয়ে বিলে মাচ ধরচে। নস্কর চিনেচে।

চিনাচ্চি। সদরে ছেলেরা নেই? সেতা হাসপাতাল হতে ঘরে যেতে হয় না?'

সদরের ডাক্তার এখন অত্যন্ত ভয়ে, খুব যত্নে আন্দিকে দেখবেন বলে কথা দেন।

'দেকবে না? ওর বাপ দেকবে।' বলে গোবিন্দ গায়ের জামা খোলে ও ঘুরিয়ে বাতাস খায়।

আন্দিকে ভেতরে নেওয়া হয়। বহুক্ষণ সযত্নে দেখে সদরের ডাক্তার ক্রমে কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তারের ভূমিকায় ঢুকে পড়েন ও হাসপাতালের ডাক্তারকে বলেন 'অপারেশন।'

'করবেন?'

'হ্যাঁ। বুঝতে তো পারছেন। এখনি অপারেশন করলে, মানে সেপসিসের ফোকাসটা।'

'চোখ নষ্ট হয়ে যায় নি?'

'ডান চোখটা বোধ হয় তেমন…এগুলো ইনফেকশন। কিন্তু না করলে…'

'এখানে।'

'যেমন ব্যবস্থা, এখানেই করতে হবে।'

'কি করে?'

'সদর চলে যাচ্ছি আমি, সব নিয়ে আসব।'

গোবিন্দ বলে, 'সেটি হচ্ছে না। এখানেই থাকচেন এখন। আমার নাম গোবিন্দ দাস। যা দরকার লিখে দিন, নিয়ে আসব।'

হাসপাতালের ডাক্তার বলেন 'টাকা…'

সদরের ডাক্তার বলেন, 'বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যা নেব, হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি থেকে। একবার বলেও আসব। তাতে বিশ্বাস যাবে তো? সঙ্গে যাচ্ছি।'

'দাঁড়ান।'

সাইকেল নিয়ে নস্কর বাড়ি যায় গোবিন্দ। হেদো নস্কর তখনও

এসে পৌঁছয় নি। নস্করের ছেলেকে বলে, 'বেন্দা, পঞ্চাশটা টাকা দে। কাকাকে বলবি আমি চেয়ে নিয়ে গেছি।'

বৃন্দাবন সব কথাই জেনেছে। বিনা বাক্যে ও টাকা এনে দেয়। গোবিন্দ বলে, 'বলে দিবি গ্রাম কল্যাণ ফাণ্ড থেকে নিলাম।'

টাকা নিয়ে আসে গোবিন্দ। বলে, 'চলুন। আজই ফিরব। দেড় ঘণ্টা বাদে ট্রেন।'

'কাল ফিরলে হতো না?'

'না।'

'রাতে…'

'হ্যাচাক জ্বেলে দোব না হয়।'

সদরের ডাক্তার নেহাৎ ম্রিয়মান হয়ে গোবিন্দের সঙ্গে যান। বিপদ, মহা বিপদ। পার্টির ছেলে যদি এ রকম করে…এবার উনি কলকাতায় কেটে পড়বেন।

হাসপাতালে ডাক্তার আন্দিকে বলেন, 'বুড়ী মা! এখন ভর্তি করে নিচ্ছি, জানলে? কিছু খাও, ওষুধ দিচ্ছি, খেলে ঘুম আসবে।'

'ভর্তি করে নেচ্চ?'

'হ্যাঁ।'

একটি মলিন বিছানায় স্থান পায় আন্দি বুড়ী। নন্দ স্টেশন থেকে চা পাঁউরুটি এনে মাকে খাওয়ায়। ডাক্তার ওকে ওষুধ দেন ও ক্ষমা-প্রার্থীর ভঙ্গিতে হেসে নন্দকে বলেন, 'আমিও একটু মাথায় জল দিয়ে দুটো খেয়ে আসি। গোবিন্দ গেছে যখন, ডাক্তারও আসবে, অপারেশনও হবে, তখন আবার খাটনি আছে।'

'আপনি ঝাও।'

নন্দ এখন বকুলতলার চটটিতে গড়িয়ে পড়ে। আন্দির চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। আন্দি হাত দিয়ে পরখ করে দেখে খাটের লোহার

পাশি। চোখের কি হবে, তা ওর মনে থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ও। হাসপাতালে নানাবিধ জিনিস খাবে, সেই সদর থেকে ডাক্তার আবার আসবে, 'সব ঝ্যানো রূপকতার মতো হতেচে পরের-পর।' সবিস্ময়ে অস্ফুটে বলে ও এবং এই রূপকথার খাদে ঘুমের মধ্যে ওর মুখখানি অত্যন্ত তৃপ্ত দেখায়।